প্রাক্তনী

PRAKTONI

CALCUTTA UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION
OF GREATER WASHINGTON DC 2021

প্রাক্তনী

Praktoni

Annual Magazine

Volume 11

Calcutta University Alumni Association of

Greater Washington DC

www.cuaa-dc.org

সম্পাদনা
নন্দিতা দাশগুপ্ত
ধ্রুব চট্টরাজ

প্রচ্ছদ
যশোমান ব্যানার্জী

অভিজ্ঞান নির্মাণ
যশোমান ব্যানার্জী
পর্ণা চট্টরাজ

পরিকল্পনা, বুনন, বিন্যাস ও নির্মাণ
নন্দিতা দাশগুপ্ত

অন্তর্জাল প্রযুক্তি
যশোমান ব্যানার্জী
সুজয় লাহিড়ী
দেবাঞ্জন বিশ্বাস

প্রকাশনা
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তনী সংসদ
বৃহত্তর ওয়াশিংটন ডি.সি.

পরিচালক মন্ডলী
নন্দিতা দাশগুপ্ত
যশোমান ব্যানার্জী
ধ্রুব চট্টরাজ
তপন বেরা
সঙ্গিতা ঘোষ
মিতালী সাহা (প্রয়াত)
পর্ণা চট্টরাজ

উপদেষ্টা পরিষদ
অপর্ণা প্রধান
বিধানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
দিলীপ সোম
তারক ভড়

নির্বাচন কর্মসমিতি
দেবকুমার চট্টোপাধ্যায়
রাধেশ্যাম দে
শঙ্কর বসু

সূচিপত্র

রচনাকার	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
Nandita Dasgupta	From the President's Desk	৪
মিতালী সাহা স্মরণে	**In Memory of Mitali Saha**	
Nandita Dasgupta (On Behalf of the CUAA-DC BoD)	Obituary: Mitali Saha	৫
Bharati Mitra	For Mitali: A Tribute	৬
বিশ্বজিৎ সেন	মিতালী	৭-৮
Dhruba K. Chattoraj	Remembering Mitali Saha	৯
জয়তী বেরা	ঝরে পড়া এক নক্ষত্র	১০
Neil Ghosh	"I Had a Beautiful Life"	১১-১২
Soumya Mitra	My Guru ji – With Respect and Admiration…	১৩-১৪
সত্যজিৎ রায় শতবর্ষ: পথের পাঁচালী		
যশোমান ব্যানার্জী	একশ সত্যের জিৎ	১৬
Ranjan Gupta	Discovering Satyajit Ray	১৭-১৯
সোমনাথ বক্সী	ফাইনম্যান, পটলবাবু, এবং মানিকবাবু	২০-২৩
Sumitra Mitra Reddy	A Glimpse with Personal Notes on Satyajit Ray's Continuing Legacy of Pather Panchali, Feluda, and More…	২৪-২৯
বিবিধ		
Amrita Dasgupta	Audrey	৩০
Anjali Bhattacharyya	Our Unsung Heroes	৩১-৩২
Anjali Bhattacharyya	The Pandemia	৩৩-৩৪
Anjali Bhattacharyya	Three Pieces of Banana Bread	৩৫
অরুন্ধতী ঘোষ	প্রবাসে শরৎ ঋতু	৩৬
বেনামী	পাব না তোমায় জানি	৩৭
ভারতী মিত্র	খেলা ভাঙার খেলা	৩৮-৪৪
বিকাশ দাস	আনন্দ আশ্রয়	৪৫-৪৬
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪)	৪৭-৫১
Dhruba K. Chattoraj	"They" as a Singular Pronoun	৫২-৫৩
গৌরীশঙ্কর মুখার্জী	হোয়াটস্এ্যাপ	৫৪-৫৫
যশোমান ব্যানার্জী	শব্দ	৫৬
Jayasree Basu	Our Discourse	৫৭-৫৮
মৌসুমী মোহারার	দুই পোর্টল্যান্ডের কাহিনী: A Tale of Two Portlands	৫৯-৬১
Mrinal Kanti Dewanjee	Soft Jelly Plug of Platelet-fibrin Thrombus in the Injured Artery Kills the Heart and Brain resulting in Death and Paralysis: Preventive Measures with Exercise, Diets and Drugs	৬২-৭১
নমিতা কুণ্ড	মহাদানব	৭২
রঞ্জিত দাশগুপ্ত	গোপন কথাটি	৭৩-৭৫
Santanu Dasgupta	Gecko Eggs	৭৬-৮০

From the President's Desk

Dear Friends and Well-wishers of CUAA-DC,

Season's greetings!
This is the second year of the global pandemic that the world is enduring. And so are we – the members of CUAA-DC! That is why this year too, we are compelled to present you with a virtual *Praktoni* – our annual magazine. On health safety grounds, we had decided to refrain from organizing our Annual Day this year at the Potomac Community Center. You might recall that typically, it is on this auspicious occasion that we distribute hard copies of our beloved magazine, the fruit of our fraternity's labor of love. Hence, this soft copy for you!

That said, we did venture to organize the 2021 Annual Picnic in person, which was a remarkable success with more than 80 attendees. We truly were elated and humbled to be graced with the venerable presence of our alumni. The opportunity to meet friends after more than a year joyously inspired all of us to participate at the outdoor event!

In honor of the birth centenary of the cinema maestro—Bengal's pride and internationally acclaimed -- Satyajit Ray -- an alumnus of Calcutta University, the theme of our magazine this year is *Pather Pachali*. This issue of *Praktoni* thus serves as a memento of the milestone cinema directed by Ray in 1955, that brought him global fame. *Pather Pachali*, quite literally, refers to the song of the road -- the song of the journey of life – some of the times mellifluous and at other times staccato -- that each of us experience in our own unique ways.

This year, we had to endure untimely losses of dear ones in our fraternity. Dr. Manik Ghosh, the beloved husband of CUAA-DC current board member Dr. Sanchita Ghosh, passed away on August 6, 2021. We have also lost Mrs. Mitali Saha, the Cultural Secretary of our present board, who passed away on October 23, 2021. Mr. Anupom Ghosh, the son of our veteran member, Dr. Mihir Ghosh and Mrs. Anuva Ghosh, departed on November 29, 2021. We solemnly extend our deepest condolences to the bereaved families.

All the activities and events by CUAA-DC this year (and always) have been made possible due to the relentless service and diligence rendered by the members of the board and by others belonging to the CUAA-DC fraternity. You all make us proud by your love and dedication to the noble cause of the CUAA-DC. I extend my deepest gratitude and heartfelt thanks to each one of you.

I do hope that 2022 will mark the end of the pandemic so that we will again be able to celebrate our Annual Day in person and would have the opportunity to experience the next volume of *Praktoni* as a hard copy.

Thank you very much. Wishing you happiness, health, safety, and peace.

Most respectfully,
Nandita Dasgupta
December 2021

Remembering Mitali

In Memory of

MITALI SAHA

(September 24, 1967 – October 23, 2021)

মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়
নহে বিচ্ছেদের ভয়
শুধু সমাপন।

A sad note awaits us.

Our fellow alumnus, Mrs. Mitali Saha peacefully passed away on October 23, 2021, at her home in Maryland, surrounded by her family.

Mitali, a bachelor and master's degree recipient in Psychology from Calcutta University was the Cultural Secretary of the current Board of Directors of CUAA-DC. She was an active and devoted member of CUAA-DC.

Mitali was a loving wife, a doting mother, a compassionate friend, a committed and well-respected professional in the federal government, a distinguished musical artist with a nightingale voice and a highly cherished and much-loved member of our fraternity.

Her untimely demise is a great loss to CUAA-DC. We will forever remember her -- fondly, affectionately, and respectfully -- for her dignity, wisdom, wit, sharp intellect, her inimitable sense of duty and responsibility, her cheerful disposition, beautiful smile, empathy, warm heart and her indomitable zest for life.

With a tearful heart, we bid her adieu on her journey to eternity.

We extend our deepest condolences to all who Mitali leaves behind -- her loving husband Snehansu Saha, her two beloved sons – Souvik and Shourjo Saha, her brother-in-law Sudhansu Saha, sister-in-law Rama Saha, her extended family across the globe and many dear friends.

From
The CUAA-DC Board of Directors (2019-2021)

Remembering Mitali

For Mitali: A Tribute

Bharati Mitra

Another light was put out before it's time….

Another Star has fallen.

Or was it just the reverse?

Was it a Star that had descended amongst us?

And now, to our utter dismay, has returned to her own golden path…

To reunite with her other – celestial - friends?

You graced us with your bright presence,

Your warm smile…

Your Nightingale voice…

Your caring loving heart.

Rest now for a bit until we reunite with you one by one….

And sing, and laugh and joke with you – once again -

On the other side – in a different world -

The one among the stars.

Until then, love and sweet remembrance dear one!

মিতালী স্মরণে

মিতালী

বিশ্বজিৎ সেন

একটু আগে আমরা মিতালীকে চিরবিদায় জানিয়ে এলাম। ভার্জিনিয়ার আলেক্সান্ড্রিয়া শহরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ভবনে। প্রায় আড়াইশো কাছের মানুষকে চোখের জলে ভাসিয়ে মিতালীর জাগতিক অস্তিত্ব বিদায়ের প্রস্তুতি নিল। সংস্কৃত মন্ত্রের উচ্চারণের আধ্যাত্মিক পরিবেশে পার্থিব সত্বা যাত্রা করল অনন্তের পথে। আমরা তখন সবাই বসে ছিলাম, মিতালীর স্বামী – আমাদের তিরিশ বছরের বন্ধু – পল্টনের পাশে। উপলব্ধি করছিলাম জীবনের চলার পথে ভুলে যাওয়া – অথচ ফল্গুধারার মতো চিরপ্রবহমান – জীবনের নশ্বরতার কথা। মাত্র দেড় মাসের বিনির্ণয়। ব্যাধির প্রতিরোধহীন সম্প্রসারণ। তারপর জীবন থমকে গেল। মাত্র পঞ্চাশের কোঠায় এসে।

মিতালীর সাথে আমাদের পরিচয়ের ব্যাপ্তি তিরিশ বছরের ও বেশি। পল্টন আর আমার তখন ব্যাচেলর জীবন। মেরিল্যান্ডে একই অফিসে আমরা তখন কাজ করি। একদিন গাড়িতে বসে পল্টন একটা ক্যাসেট চালিয়ে দিল। এমন সুরেলা কন্ঠ। আমিতো প্রশ্ন করেই ফেললাম – লতা মুঙ্গেশকার? পল্টনের লাজুক হাসিতে বুঝে গেলাম শিল্পী আর কেউ নয় – এ নিশ্চয়ই পল্টনের বাগদত্তা মিতালীর কন্ঠস্বর। অপূর্ব সুরেলা সেই কন্ঠস্বর। যে কন্ঠের গান একবার শুনলে মনে থেকে যায় চিরদিনের জন্য। তারপর একদিন মিতালী পৌঁছে গেল এই সুদূরের দেশে। শুরু হলো পল্টন আর মিতালীর নুতন জীবন। দুই মাসের মধ্যে আমিও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলাম। আমার স্ত্রী রত্না এই দেশে পৌঁছে গেল তার কিছুদিনের মধ্যেই।

এর পরের তিরিশ বছরে ছড়িয়ে আছে মিতালীর অভিবাসী জীবনের সুখ দুঃখের গল্প। ছড়িয়ে আছে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার সাধনার কথা – সাধনার শেষে প্রতিষ্ঠার উপাখ্যান । সেই চলার পথে সহযাত্রী ছিলাম আমরা দুই পরিবার। আমার স্ত্রী রত্না আর মিতালীর মধ্যে গড়ে উঠেছিল এক গভীর বন্ধুত্ব। খুব কাছ থেকে তাই প্রত্যক্ষ করেছি মিতালীর উত্তরণ। কম্পিউটার বিজ্ঞানে নিজেকে পারদর্শী করে তোলা। মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রাপ্তি। আমেরিকার ফেডারেল সরকারের চাকরি। একই সঙ্গে মিতালী মানুষ করেছে দুই পুত্রকে। সঙ্গীতের প্রতি গভীর আবেগ নিয়ে গড়ে তুলেছে সঙ্গীত শিক্ষার কেন্দ্র। যার নাম "তালিম"। অন্যদিকে পল্টনের উত্তরণ হয়েছে ব্যবসার সফলতায়। বিধাতা সৃষ্টি করেছে রূপকথার এক সুখী সম্ভ্রান্ত পরিবার।

মিতালীকে বিদায় জানিয়ে এসে এই সব কথাই মনে আসছে বারবার । আর ভাবছি জীবনের নশ্বরতার কথা। মৃত্যুকে সাথে নিয়েই আমাদের জন্ম হয় এই সুন্দর পৃথিবীতে। আমাদের অবচেতন মনের উপলব্ধিতে আমরা জানি একদিন আমাদের সবাইকেই বিদায় নিতে হবে এই পার্থিব জগতের মায়া কাটিয়ে। অথচ দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে ছন্দ আমাদের বিস্মৃত করে রাখে। আমরা ভুলে থাকি সেই কঠিন সত্যকে। হঠাৎ কোনো প্রিয়জনের মৃত্যুশোক আমাদের সেই অবচেতন উপলব্ধিকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আবর্তে নিয়ে আসে। ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় আমাদের জীবনের স্বস্তির আবেশে মাখানো স্থিতির প্রলেপ কে।

মিতালী স্মরণে

তবু তো আমাদের বেঁচে থাকা। বেঁচে থাকা প্রিয়জনের স্মৃতি নিয়ে জীবনের সেই শেষ দিন পর্যন্ত। উদ্বেল শোকের প্রথম বিহ্বলতা কাটিয়ে মিতালীর স্মৃতি একদিন শান্তির উদ্বেলহীন পারাবারে এক উজ্জ্বল জোতিস্ক হয়ে বেঁচে থাকবে।। স্নিগ্ধ আলোয় ভরিয়ে দেবে আমাদের পার্থিব আঙিনা। উজ্জ্বল জোতিস্ক হয়ে বেঁচে থাকবে পল্টনের কাছে, দুই ছেলে মিমো ও মিকাইরের কাছে, মিতালীর মায়ের কাছে – পরিবারের অন্যান্য এবং আমাদের সবার কাছে।

মিতালী ভালো থেকো। দেখা হবে।

Remembering Mitali

Remembering Mitali Saha

Dhruba K. Chattoraj

Separation or taking leave of someone is generally painful. But it hurts more when it is a younger brother or sister. I realized this when I lost two of my younger siblings back home. The feeling is even more here because Mitali was closer to home.

I have known Mitali mainly as a stage performer and admired her amazing musical talents but came to know the person in the past few years when we were both board members of CUAA-DC. She was interactive, full of innovative ideas, quick in decision making and got her points through without offending anybody. She organized and brought a touch of class to all our cultural programs. Most impressive of all was her fluency and articulation in three different languages.

Mitali left us abruptly. It is difficult to understand in the bigger scheme of things what the point is of cutting short a productive life and snatching someone from their dear ones without warning. I am sure wiser men have dwelled on this unanswerable question. My own take is that since we don't control birth and death, every minute of our existence should be considered a gift and we should be grateful for what we received rather than what we won't.

Easy to say but may not be easy to practice by those who suffered the loss. I pray that the Saha family gain the strength to reckon with the reality and try to recall only the good times they had with Mitali.

মিতালী স্মরণে

ঝরে পড়া এক নক্ষত্র

জয়তী বেরা

পদ্মের মতো প্রস্ফূটিত ছিল জীবন তব,

উজ্জ্বল তারকা তুমি অঙ্গে অঙ্গে, প্রাণ ছিল, ছন্দ নব নব।

বিশ্ব তালে রেখে তাল কাটিয়েছিলে ক্ষণকাল,

মর্মর মুখর সদাহাস্য অনন্তহীন কৌতুক রাশি,

হৃদয় বক্ষ জুড়ে ছিল চির ফাল্গুনের আবেশ।

প্রাণবন্ত ছিলে তুমি, উল্লাসের পটে বিছিয়েছিলে বিহ্বলতা,

কত প্রাণে দিয়েছিলে দোল, চিত্তে দিয়েছিলে স্বকীয়তা।

উজ্জ্বল নক্ষত্র তুমি এসেছিলে এ ধরণী বক্ষে

অপরূপ ছন্দ তালে প্রাণ তরঙ্গ, মালা হেরি,

ছুয়েছিলে অন্তহীন জোয়ার ভাটার প্রতি হৃদয় কক্ষ।

স্বরচিত নবীন কাব্য গল্পে মাতিয়ে দিতে ধরা

বিন্দুমাত্র ছিলোনা তাতে বিষাদের কোনো ছায়া।

যেমনটি হয় রাগরাগিণীর আলিঙ্গনে

জ্যোৎস্না বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী,

তুমিই ছিলে সেই তারকা নারী মহিয়সী।

হঠাৎ তুমি সব ছেড়ে চলে গেলে

মহাসমুদ্রের কুলহীন বক্ষ তলে।

কত মধুর স্মৃতিময় ক্ষণ সহজে কি ভোলা যায়,

অসামান্যা এ নক্ষত্রের অসময়োচিত পতন।

Remembering Mitali

"I Had a Beautiful Life"

Neil Ghosh

A loved one's death can leave us feeling shocked, angry, sad, depressed and more. Death is a natural part of life, and we can't beat death.

But how do we accept the reality of the sudden loss of a young person full of life? How do we deal with so many overwhelming emotions? How do we find peace? Why is life so unpredictable? Why is life so unfair? Why bad things happen to good people? What can we learn from death?

I have been pondering these questions for many years. Mitali Saha's untimely departure at the age of 54 shook me, and our entire community, to the core. How can we possibly accept losing a wife, mother, daughter, sister and dear friend, at this early age?

We are all taking stock of what is really important. We are making a conscious decision to spend more time with people who are uplifting and compassionate and we are focusing more on quality and not quantity. Positive people improve our feelings and emotions because of how energy is transmitted. We are realizing more than ever before that gratitude unlocks the fullness of life. We are seeing our own mortality. **The future is now!**

As everyone tries to deal with this tremendous loss and personal grief, I want to focus on the life Mitali lived and

the people she touched far beyond her immediate family. **"I had a beautiful life," Mitali said to her beloved husband several times during her last days. She sure did.** This is what we want to remember about Mitali. "As is a tale, so is life: not how long it is, but how good it is, is what matters."

Each of us is finding our own way to remember Mitali. We all loved Mitali for her dignity, her cheerful disposition, her sense of humor, her infectious smile, her warm heart, and her musical talent. I read all the messages on Mitali's obituary page, and the messages from my Facebook posting. And thanks to her family, I also had the privilege of reading all the cards and many messages that her family received from you. They are heart-wrenching and heartwarming, and I would like to share some of them with you. These messages reflect the true character of a person who boldly stated during her last days, "I had a beautiful life."

"There are countless things that I appreciate about you: your infectious laughter, your sense of humor, your caring nature, your beautiful singing (even if I didn't always know the words), your grace and how you carried yourself, your friendliness to everyone around, your selflessness and always being willing to lend a helping hand, your honor and respectfulness, your Indian cooking … and many more"

"A soul so pure shall keep inspiring us."

"Memories build a special bridge of a lifetime."

"Mitali was a perfect person with a great heart and an immense contribution she made to the world and to the lives of us. She is looking down on us with pride and joy."

"Love outlasts, outshines, outdistances any sadness we can know."

"Some people touch so many lives in kind and loving ways. They leave us lasting memories that shine our days.

"She is amongst them but in different forms – in the air that they breathe, in the music that they listen to, in the smiles that they spread, in all the beautiful thoughts that they think and the wonderful deeds that they perform".

"In the words of Tagore:

ফুরায় যা, তা ফুরায় শুধু চোখে
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার
যায় চলে আলোকে.

Mitali Saha's family wishes to extend their sincere thanks to all their extended family, friends, and community members near and far for their love and support.

Mitali packed more life in her years than years in her life and she has left us with indelible memories to cherish forever.

My Guru ji – With Respect and Admiration…

Soumya Mitra

Growing up, my mother was my inspiration for stepping into the world of music. She is a trained singer in Nazrul Geeti and Rabindra Sangeet. I never had any formal training in music. Perhaps, my unofficial training initially began by listening to my mother. Akash Vani Kolkata and FM radio stations also played a significant role, as I passionately listened to the renditions of the Maestro – the one who acted, composed, penned lyrics, directed, and sang over 4500 songs in movies and in Bengali Puja albums. I have heard that Kishore Kumar never had any formal training in music. I invoke that hearsay for my peace of mind or salute his true genius.

My passion for music remained in the back burner throughout my academic life. Deep in my heart, I kept searching for someone, who can teach me the grammar, the notes, the essence, and the language of music. I met Mitali di four years ago. On our first conversation over telephone, a calm and enthusiastic voice invited me to her home, literally for an audition to sing "Yaadon ki Baarat" in her program at Sanskriti Durga Puja. On day one, I was amazed by her mellifluous voice, startled by command and grip in Indian classical music, my instinct found that "Guru" who I was in search for. I urged her - "Mitali di, would you please teach me music?" She graciously accepted me as her student in her music school "Taalim". My short journey with my Guru ji began.

I had my good fortune of learning some of raag Yaman and Bhairav from her. She was a great teacher. Caring, patient and yet meticulous. She pushed my comfort zone, challenged me, corrected me when my notes went haywire, redrew my limits and stretched the boundaries. At times, it was hard to achieve but that's what I wanted. Sixty minutes with her every week passed in a jiffy.

Being a scientist, we are trained to closely analyze correlations, deduce by extrapolations, and make our own inferences. I connected with Mitali di even on a basic science level. From our several discourses, I realized that she was extremely intelligent, apart from being a very kind and generous person. In one of our discussions, we chatted on a rather interesting concept. I said - "Mitali di - just 5 nucleic acids, creates 20 amino acids that translates into millions of proteins, which orchestrates into the creation of millions of species, including human beings". She said – "Imagine what

seven musical notes can do." On research, it occurred to me that 7 notes have 16 swara variations, permutation and combinations results in approximately 36000 known Raagas,[1] and several billion melodies.[2] Music correlated with science, that's how I resonated with Mitali di. She taught me the logic, the symmetry, the variations, the combinations, and the mathematical application of these seven base notes, which creates a parallel world of music. This realization triggered my interest into the world of raagas. That's what a true Guru does, subtly catalyzes the hunger to learn more. As I transcended into few raagas that she taught me, with my closed eyes, I used to get relief from stress, and perhaps transiently got disconnected from this world. Although intangible, one can feel it, sense it, and experience it using one's vivid imagination – my Guru ji was correct.

The scientific reason of stress relief, that Mitali di explained, was that we are forced to engage every neuronal brain cell to concentrate on the musical notes, to perform perfect transition, connecting one note to the other. So, I asked Mitali di another day – "Is this the reason why many trained singers close their eyes while singing?" She replied with a radiant smile – "Perhaps yes."

This was a facet of a wonderful teacher from a student's perspective. Today, I realize that those sixty minutes of practice lessons with Mitali di every weekend is my treasure to preserve. Golden moments etched into my memory lanes that I will always cherish. My Guru ji resides in my imaginations, she still inspires me to push my limits, and keeps my passion alive to learn more about music. Memories of my Guru ji will reside in a very special corner of my heart. Forever.

---

[1] http://prachodayat.org/fantastic-use-permutations-combinations-indian-music/

[2] https://plus.maths.org/content/how-many-melodies-are-there (the number is around 8.25×10^{19})

সত্যজিৎ রায়
শতবর্ষ স্মরণে

সত্যজিৎ রায় শতবর্ষ স্মরণে

একশ সত্যের জিৎ

যশোমান ব্যানার্জী

আশায় আছি
জিতে যাবে দেশ মাটি
দেখব আলো কাটবে দু:সময়
জীবন যে আজ সোনার পাথর বাটি
মনে ঘিরে আজ সত্যজিৎ রয়।

Discovering Satyajit Ray – A Renaissance Man

Ranjan Gupta

To millions of Bengalis, at home or abroad, Satyajit Ray remains an icon of cultural identity, along with others like Rabindra Nath Tagore. Living in Kolkata in the 1970s, at a time when Satyajit's creative talent was at its peak, my generation grew up with his books and films. Of course, numerous accounts and biographies have been written about him by many famous people, from film critics to his peers and experts in the field of creative and performing arts. However, as a reader or a movie-goer, each of us may have our own take on how he has influenced our thoughts and inspired our imagination.

As a young adult, I enjoyed Satyajit's works but I did not develop any particular opinion about him, as a person. Perhaps, I had not given it much thought. Rather, as I grew older and understood more about the world around me, Satyajit's works helped me to relate to these events better and revealed to me his wisdom by which I could interpret the happenings around me. In this essay, I have assembled some random thoughts that have flashed in my mind, while remembering Satyajit Ray.

It is important to mention at the onset, that many of his popular films are based on the writings of his predecessors, celebrated in their own right (such as Rabindranath, or Upendra Kishore or Bibhuti Bhushan). Yet, Satyajit's films have given them life and form and made them accessible to the masses, including those who cannot read. The beauty of it all is that in presenting the stories to the viewers, he has remained as true to the original materials as possible, always enhancing but never detracting from the essence of these writings. When you see the films and you read the books, the characters in the books seem to naturally blend in with the actors/actresses and the roles they play. It is often the case that when you read a book and then see the movie you realize that the film does not do justice to the book or that while the stories seem to be captured, some of the players do not fit the part or depict person that you had imagined from your reading. Not so with Satyajit! Whether it is Pather Panchali or Jana Aranya, the characters and the players just fit the mould. While reading about Indir Thakurun, I cannot but think of Chunibala in the movie – the two just blend into one another, a perfect fit like a hand and glove!

Politics has never been my strong point. While in college, I avoided it like the plague and tried to run from it as far as I could. However, recent world events on national and international stage have made me concerned and even alarmed about our own future and that of our posterity. Relating real-life news to the

stories of Halla and Shundi, I now realize how the concept of war is fed to the public, as if to keep them in a trance, and to distract them from more pertinent issues at hand. Freedom may be threatened in the hands of a power-hungry tyrant, who uses the media to spread false news and propaganda to the gullible masses, much the same way as Hirak Raja tried to brainwash his subjects, using his "Jantar-Mantar." The children's movies by Satyajit that were merely magical at one time, have suddenly a new meaning. Perceiving them in a new light, such revelation brought me to my OMG moment!

Speaking of children's movies and books, the stories of Feluda and Prof. Shanku captured our imagination well into our teens. Beyond the overall plots and storytelling, Satyajit seems to enjoy throwing out morsels of knowledge to the average reader, in playful humor. Coming from a family that had a penchant for technology, and moving in intellectual circles, Satyajit undoubtedly had insights into the lives of prominent scientists to realize that the world of science, like any other occupation, is no stranger to professional rivalry and ego, and that not all scientists match the image of an absent-minded scientist, who is devoted to the selfless act of saving the world. This is well illustrated in the sci-fi books of Prof. Shanku. One particularly amusing moment is when Shanku goes to a scientific conference, and someone comes up to congratulate him on his great achievements. Shanku, quietly reminds the reader that the world knows that he is great and so he finds no reason to be too humble or modest in accepting such felicitations.

The stories of Feluda enraptured our young minds with awe and wonder and we always waited eagerly for his next adventure. In my mature years, as I re-read them, I found nuggets of hidden gems that I had not observed before. Through these stories, Satyajit tried to instill in young minds an appreciation for history, fine arts and anything of aesthetic value. Take, for example, the mesmerizing anecdotes of Sidhu jetha, as he recounts incidents from the past. Elsewhere, Satyajit exposes the reader to exotic books and to the world of antiques. So, in the midst of a plane ride, we find Feluda absorbed in the pages of "Aku Aku" by Thor Heyerdahl, we learn that besides "Tuntunir Boi" there is Tin Tin (টুনটুনির বই নয়, টিনটিনের বই) - long before it became ever-so-popular in India. While poking fun at Jotayu's poetic ambition, he reminds us (in Jotayu's words) "koto soto akhyato Michael Angelo, ekoda ei Bharat borshey chelo" (কত শত অখ্যাত মাইকেল এঙ্গেলো / একদা এই ভারতবর্ষে ছেলো). Thinking of the Perigal Repeater or the dagger of Jung Bahadur Rana, I have often wondered what fascinating stories Satyajit may have weaved, had he watched the "Antiques Road Show" or "Chesapeake Collectibles" on PBS. Through his film "The Inner Eye", Satyajit brought to our attention, the life and works of Binod Bihari Mukhopadhyay, a blind artist from Bengal. Ironically, through this film, Satyajit seems to challenge the Bengali

psyche, which mostly focuses on literature and the performing arts but often remains blind to the art of painting and sculpture. Being an artist himself, he beckons us to open our eyes to the world of fine arts and appreciate the talents who go unrecognized or underappreciated.

I will end this discussion by going back to Pather Panchali by Bibhuti Bhushan - a story of trials and tribulations of a simple yet respectable family in rural Bengal, trying to rise above poverty and build a sustainable future for the next generation. The book is a "must-read" for every Bengali who values literature, tradition and his/her deep roots. Through Apu's trilogy, Satyajit brings this simple story to the world stage: the struggles of Harihar, Sarbajaya, Durga and Apu may be set in the context of Bengal but these are the struggles across the world of every man, woman and child, who has the desire and aspiration to be someone, to be recognized, to be loved, to be given the dignity – not because who s/he is or what s/he does, but as a human being, as an individual!

Coming to America, over the years I have met many people from all walks of life, from all corners of the earth. When I hear the stories of people who came to this country with only twenty dollars in their pockets, of a young man who rose from humble beginnings of rural Midnapore to heights of professional achievements in the halls of fame, of a "boudi", who gave up an affluent lifestyle in Kolkata to take up a job in a factory in the mid-west so that her children could have the best education in this country, or an immigrant who risked his/her life on a perilous boat ride in pursuit of a dream, I am reminded of the story of Apu – the victorious, the unvanquished (Aparajito)! Satyajit brings to life the journey of the human spirit that will never give up, against all odds, to "climb every mountain" to find one's dream! By telling this story to the world in films, Satyatjit has made Pather Panchali universal.

In conclusion, with age and experience, I seem to have rediscovered Satyajit and learned to appreciate his work in my own way. I am sure that others who read his books and see his films will find their own interpretations of his immortal works.

ফাইনম্যান, পটলবাবু, এবং মানিকবাবু

সোমনাথ বক্সী

বেশ কয়েকবছর আগের ঘটনা। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির সিস্টেমস বায়োলজি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে একটা বারান্দায় সন্ধ্যেবেলা কফি নিয়ে বসে আমার এক ল্যাবমেটের সাথে আলোচনা চলছে। আমার সেই কলিগ তার কাজের মূল্য নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করছিলো আমার কাছে। ভালো নামকরা জার্নালগুলো কি আদৌ উৎসাহী হবে তার কাজ পাবলিশ করতে? এমন কাজ নিয়ে কি পরবর্তীকালে চাকরির অফার, কিংবা গ্রান্ট পাওয়া যাবে?

এমন দুশ্চিন্তা আসলে আমাদের সবার মনেই মাঝে মাঝে ঘুরতো। আসলে আমাদের ল্যাবে, অর্থাৎ প্রফেসর ইওহান পউলসনের ল্যাবরেটরিতে, যে সমস্ত কাজ হতো, তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আপাতঃভাবে খুব সামান্য কোনো বিষয়ের একটি ছোট্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ে। যেমন কিভাবে কোনো একটি প্রোটিন, যা কিনা প্রতি ব্যাক্টেরিয়াতে গড়ে প্রায় ৫ টি করে রয়েছে, ঠিক কতভাগ ব্যাক্টেরিয়াতে একদম শূন্য সংখ্যায় রয়েছে এটি নির্ভুলভাবে বলা যাবে। এর জন্য শুধু গণিত নয়, চাই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে তা নির্ভুলভাবে গণনা করার উপায়। কাজটা আপাতঃভাবে সহজ শোনালেও, সমস্ত কিছু বিস্তারিতভাবে ভাবলে খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এক হিসেবে খুতখুঁতেমি-টাই আমাদের ল্যাবের কাজের আসল বৈশিষ্ট্য ছিল বলা চলে। তবে গবেষণার জগতেও একটা বাজার রয়েছে, আর রয়েছে জীবিকার চিন্তা। তাই কাজের ‘দর’ নিয়ে দুশ্চিন্তাও গবেষকদের বিজ্ঞানচিন্তার মাঝে কালোমেঘের মতো ছায়া বিস্তার করে রাখে। এই আলোচনার দিনটিতে আমার সেই কলিগটির মনেও তেমনই ঘনঘটা চলছিল। তাকে আশ্বাস দিতে গিয়ে আমার হঠাৎ ফাইনম্যানের একটি চিঠির কথা মনে পড়ে গিয়েছিলো। কোইচি মানোম নামে ফাইনম্যানের এক প্রাক্তন ছাত্র তাকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি চিঠি লিখলে, প্রত্যুত্তরে ফাইনম্যান জানতে চান কোইচি তখন কি বিষয়ে গবেষণা করছে। উত্তরে কোইচি জানায় যে সে ‘কোহেরেন্স’ তত্ত্বের এর একটি এপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করছে, এবং এপ্লিকেশনটির কথা উল্লেখ করে শেষে যোগ করে - ‘a humble and down-to-earth type of problem’। কোইচি আরো জানায় যে এমন একটি ‘humble’ বিষয় নিয়ে গবেষণা করার জন্য সে নিজেকে একহিসেবে ‘nameless’ মনে করে। ফাইনম্যান কিন্তু এই কথায় খুব দুঃখ পেয়েছিলেন, এবং কোইচির এই মনোভাবের জন্য তার প্রাক্তন শিক্ষক হিসেবে তার দায়বোধ করে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তিনি এর পর একটি দীর্ঘ চিঠিতে কোইচিকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে তার কাজের বিষয় নিয়ে তার এই হীনমন্যতার ভাব অত্যন্ত ভুল এবং কোন কাজ ‘humble’ আর কোন কাজ ‘grand’ তার বিচার এতসহজে করা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। একটি আপাতঃভাবে ক্ষুদ্র কিংবা তুচ্ছ সমস্যার (প্রব্লেম) সমাধান করেও আমরা কিছু লোককে সাহায্য করতে পারি এবং সাফল্যের পরিতৃপ্তি পেতে পারি, যার কোনোটাই তুচ্ছ নয়। তিনি তাই কোইচিকে অনুরোধ করেন যে, সে যেন আরো তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর প্রব্লেম নিয়ে কাজ করে যতক্ষণ না সে খুব সহজে এবং নির্ভুলভাবে তার সমাধান করতে পারে। তবেই সে সত্যিকারের গবেষণার আনন্দ উপভোগ করতে পারবে। আমার লেখার পরিশেষে আমি সেই চিঠির একটি লিংক দিচ্ছি। আগ্রহী পাঠক পুরো চিঠিটি সেখানে পড়তে পারেন। সেই চিঠিটির একটি লাইন দিলাম এখানে:

“No problem is too small or too trivial if we can really do something about it.” – ফাইনম্যান

সত্যজিৎ রায় শতবর্ষ স্মরণে

ফাইনম্যানের এই কথাটি আমাকে জীবনে গবেষণার ক্ষেত্রে বহুবার সাহায্য করেছে। কিন্তু যদি সময়ের পথ বেয়ে আরোও অনেকটা পিছনে চলে যাই, মনে পরে যায় মনে গভীর দাগ কেটে যাওয়া একটি গল্পের কথা - সত্যজিৎ রায়ের লেখা "পটলবাবু ফিল্মস্টার" - যা কিনা ঠিক এই কথাটিকেই আরো সহজভাবে আমায় শিখিয়েছিলো। সেবার কলেজ থেকে পুজোর ছুটিতে প্রথমবার বাড়ি ফিরেছি। বেলুড় বিদ্যামন্দিরে ছুটি পেতাম না তেমন একটা। বাড়িতে ফিরে নিজের পড়ার ঘরে ঢুকে দেখি বিছানার উপর রাখা একটি মোটাসোটা সবুজ বই, মলাটে বড় হরফে লেখা 'গল্প ১০১'। দেখেই আনন্দে পাতা উল্টোতে শুরু করলাম। পরে মায়ের কাছ থেকে শুনলাম উচ্চমাধ্যমিকে স্থানীয় কৃতি ছাত্রদের একটি করে ভালো বই দেওয়া হয়েছে, একটি স্থানীয় সংঘ থেকে। এই গল্প ১০১ বইটিরই একটি গল্প পটলবাবু ফিল্মস্টার। সত্যজিৎ-বাবুর, কিংবা তার বাড়ির ডাকনাম মানিকবাবুর, লেখা আমার সবচাইতে প্রিয় গল্প এটি। কারণ এই গল্পের মাধ্যমে 'কর্মযোগ'-এর এক অমোঘ সূত্র তিনি প্রকাশ করেছেন আমাদের কাছে। যা কিনা ফাইনম্যানের চিঠিটির মূলমর্মকেই আরো গভীর ও বিস্তারিতভাবে আমাদের কাছে ফুটিয়ে তুলেছে।

গল্পের মূল চরিত্র পটলবাবুও আমার মতোই একসময় থাকতেন কাঁচরাপাড়ায়। কাঁচরাপাড়াতে একটি বড় রেলের কারখানা রয়েছে। সেই রেলের কারখানায় তার একটি চাকরি ছিল, আর তার সাথে ছিল অভিনয়ের শখ। আরেকটু বেশি মাইনের একটি চাকরি পেয়ে একসময় কলকাতায় চলে আসেন পটলবাবু।

কলকাতায় এসে নিজের পাড়ায় সবেমাত্র একটা থিয়েটার-এর দল গড়তে শুরু করেছেন, এমন সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুরপ্রসারী ফলে তার চাকরিটি চলে যায়, সাথে থিয়েটার দল গড়বার সম্ভাবনাটিও। সেই থেকে বাকি জীবনটা রোজগারের ধান্দাতেই কাটাচ্ছেন পটলবাবু, কিন্তু মনের এক গভীর কোন কোথাও অভিনয়ের প্রতি ভালোবাসা আর অভিনয় করবার রোমাঞ্চকর স্মৃতি আজও জমা হয়ে রয়েছে। তাই বাহান্ন বছর বয়সে হঠাৎ করে ফিল্মে অভিনয় করার প্রস্তাব আসায় তিনি যেমন একটু হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন, তেমনই উত্তেজনায় ও আনন্দে শিহরিতও হয়ে ওঠেন। ফিল্মে তার পার্ট রয়েছে এবং তাতে ডায়ালগও রয়েছে এই খবরে তিনি পুনর্যৌবন লাভ করেন।

কিন্তু রূঢ় বাস্তবের কঠিন ধাক্কা তিনি খেলেন অভিনয়ের দিন অকুস্থলে পৌছিয়ে। তার পার্ট হচ্ছে পথচলতি নায়কের সাথে একটি অন্যমনস্ক ধাক্কা, আর তার ডায়ালগ হচ্ছে 'আঃ'। একটি কথাও না, ধাক্কা খেয়ে পটলবাবুকে উচ্চারণ করতে হবে শুধুমাত্র একটি শব্দ - আঃ। তাকে দেওয়া পাঠের তুচ্ছতা আর তার প্রতি তাচ্ছিল্যের এক দমবন্ধ যন্ত্রনায় যখন কাতর হয়ে পড়েছেন তিনি, তখনই তার নাট্যগুরু গগন পাকড়াশির কথা মনে পরে যায় পটলবাবুর। ঠিক ফাইনম্যানের কথাটিরই দ্যোতনা শুনতে পাই আমরা পটলবাবুর প্রতি গগন পাকড়াশির কথায়: "যত ছোট পার্টই তোমাকে দেওয়া হোক, তুমি জেনে রেখো তাতে কোনও অপমান নেই। শিল্পী হিসেবে তোমার কৃতিত্ব হবে সেই ছোট্ট পার্টটি থেকেও শেষ রসটুকু নিংড়ে বার করে তাকে সার্থক করে তোলা।" সেই কথা মনে পড়তেই উৎসাহ এবং উদ্যম খুঁজে পান পটলবাবু। সামান্য 'আঃ' কথাটিকেও কতভাবে বললে কতরকমের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব তা আবিষ্কার করে তিনি বুঝতে পারেন তেমন অভিনেতার কাছে এই একটি কথাই সোনার খনি। একটি নির্জন গলিতে একা একা রিহার্সাল দিতে থাকেন তিনি। গবেষণার ক্ষেত্রেও এই নির্জন সাধনার মূল্য আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করি। আর এই সাধনা থেকেই আসে 'innovation'। পটলবাবু আবিষ্কার করেন - হাতে একটি খবরের কাগজ থাকলে কিভাবে তার অন্যমনস্ক ভাবটা আরোও ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। সব

সত্যজিৎ রায় শতবর্ষ স্মরণে

মিলিয়ে ওই ছোট্ট পার্টটিকেও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নেন পটলবাবু। এসে পরে পার্টের সময়। নিখুঁত টাইমিং-এ ধাক্কা আর 'দশ আনা বিরক্তির সঙ্গে তিন আনা বিস্ময় ও তিন আনা যন্ত্রণা' মিশিয়ে আঃ শব্দটা উচ্চারণ করে নায়ক এবং পরিচালক দুজনকেই অবাক করে দেন পটলবাবু। এই আপাত তুচ্ছ কাজটিকে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করবার গভীর আনন্দ এবং আত্মতৃপ্তি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই তৃপ্তির কাছে তার কাজের আর্থিক পারিশ্রমিকটিই তখন তুচ্ছ মনে হয় তার। পারিশ্রমিক না নিয়েই চলে আসেন পটলবাবু।

আপাতভাবে 'গুরুত্বপূর্ণ' (grand) এবং 'তুচ্ছ' (humble) কাজের ফারাক না করে প্রতিটি কাজকেই ভালোবেসে নিঁখুতভাবে করবার শিক্ষা পেয়েছিলাম এই গল্পটি থেকে। কোনো কাজকেই ক্ষুদ্র করে না দেখে তার মধ্যেকার রসটিকে খুঁজে বার করে সেটা নিজে আস্বাদন করা এবং পরিবেশন করার আনন্দ উপভোগ করবার মন্ত্র আমাদের দিয়ে গিয়েছেন আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় মানিকবাবু। কিন্তু আমার উপলব্ধির তখনও কিছু বাকি ছিল।

আমার এক বন্ধুস্থানীয় দাদা কিংবা দাদাস্থানীয় বন্ধু নীলাদ্রিদার কাছ থেকে শোনা মানিকবাবুর বিষয়ে একটি ছোট্ট গল্পের কথা বলি। নীলাদ্রিদা (নীলাদ্রি ব্যানার্জি)-র সাথে পরিচয় সেই আই আইটি কানপুর থেকে। আই আইটি কানপুর থেকেই কেমব্রিজ-এ পিএইচডি করতে আসে নীলাদ্রিদা আর সাত ঘাটের জল খেয়ে আমিও আজ পৌঁছেছি এখানেই। নীলাদ্রিদা যদিও এখন কেমব্রিজ ছেড়ে লাভবরোতে গবেষক হিসেবে যোগদান করেছেন, কিন্তু এখনো মাঝেসাঝেই কেমব্রিজ-এ আসেন। সেইসময় তার সাথে আড্ডা হয়, এবং তেমনই একটি আড্ডায় জানতে পারি যে নীলাদ্রিদার বাবা (স্বর্গত অঞ্জন ব্যানার্জী)র ছবিতোলার শখ ছিল এবং তিনি সত্যজিৎ রায়ের বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়িতে প্রশিক্ষণ নেওয়া ছাড়াও বেশ কয়েকটি সিনেমার শুটিংয়ে সত্যজিৎ রায়ের সাথে ছিলেন। ১৯৭২ সালে অশনি সংকেত সিনেমার শুটিং-এর সময়কার একটি ছোট্ট ঘটনার কথা আমার খুব মনে ধরেছিলো। বোলপুরে শুটিং চলছে এবং চলছে বর্ষাকাল। মেঘবৃষ্টির ছবি তুলতেই চেয়েছিলেন মানিকবাবু, তাই বৃষ্টির মধ্যেই শুটিং এগিয়ে চলেছে। সৌমিত্রবাবু, ববিতা, গোবিন্দ চক্রবর্তী প্রমুখ বিখ্যাত অভিনেতাদের নিয়ে চলছে শুটিং। একদিন সকালে রোদ ওঠায় তিনি ঠিক করেন একটি ইনডোর দৃশ্য তুলে রাখবেন। দৃশ্যটিতে রয়েছে, বারান্দায় একটি চৌকিতে একজন শুয়ে রয়েছে, গ্রামের লোকেরা মেরে যার মাথা ফাঁটিয়ে দিয়েছে। একটি ব্যান্ডেজ সেই অভিনেতা ভদ্রলোকের মাথায় বেঁধে দেয়া হবে, এমন সময় বাধা দিলেন মানিকবাবু। গ্রামেরই একজন বয়স্ক লোককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন "একটু ঘাস থেঁতলে ক্ষতস্থানে দেয়া হয়না, রক্তপাত বন্ধ করার জন্য?" সেই বয়স্ক ভদ্রলোককে বলেন "হ্যা, তাই তো, আমার মাথাতেই আসেনি"। কলকাতায় বড় হওয়া মানিকবাবুর মনের আড়াল হয়নি গ্রামের এই 'তুচ্ছ' রীতিটি। এই খুঁতখুতেমিটাই মানিকবাবুর বৈশিষ্ট্য যা তার সমস্ত কাজকে অন্য মাত্রা দিয়েছে।

কিন্তু নীলাদ্রিদার কাছ থেকে শোনা এই ঘটনাটি থেকে আমার নিজের একটি উপলব্ধি হয়। পাঠক-পাঠিকার কাছে এখানে সেটা প্রকাশ করবো, আর তার যথার্থতার বিচারের দায়িত্ব তাদের। সিনেমা শুটিং একটি বিশাল বড় জমজমাটি ব্যাপার। অনেক বড় বড় অভিনেতা, ক্যামেরা, আলো, মিউজিক ইত্যাদি। কিন্তু সেই সিনেমা কিন্তু ছোট ছোট খণ্ডদৃশ্য দিয়ে গড়ে তোলা হয়। প্রতিটি খণ্ডদৃশ আপাতভাবে ক্ষুদ্র, পূর্ণ সিনেমাটির তুলনায়, কিন্তু তাদের গুরুত্ব অপরিসীম। পটলবাবুর অন্যমনস্ক ধাক্কা খেয়ে আঃ কিংবা গ্রামের লোকের মার্ খেয়ে মাথা ফাঁটিয়ে শুয়ে থাকা এক একটি খণ্ডদৃশ্য।

সত্যজিৎ রায় শতবর্ষ স্মরণে

একটি নিখুঁত সিনেমা গড়তে হলে প্রতিটি ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ত খণ্ডদৃশ্যকেও নিখুঁত হতে হবে। তেমনটাই করতেন মানিকবাবু।

আমাদের শিখতে হবে যে: কোনো কাজকেই ছোট করে না দেখে বৃহতের মাঝে তার স্থানটি যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করতে `পারলেই 'ছোট' কাজ করবার হীনমন্যতা কেটে যেতে পারে। আসুন মানিকবাবুর জন্মশতবর্ষে আমরা তাঁর ও ফাইনম্যানবাবুর উপদেশ মেনে আরোও ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্রতর কাজকে ভালোবেসে, তাকে নিখুঁতভাবে এবং সফলভাবে সম্পন্ন করবার শপথ গ্রহণ করি।

ফাইনম্যানের চিঠির লিঙ্কঃ

https://fs.blog/2014/08/richard-feynman-what-problems-to-solve/

A Glimpse with Personal Notes on Satyajit Ray's Continuing Legacy of Pather Panchali, Feluda, and More …

Sumitra Mitra Reddy

"Pather Panchali flows with the serenity and nobility of a big river" – Akira Kurosawa

Ray, Feluda, Topse and Jatayu for Covid-19 test?

Cleverly and imaginatively named with the acronym RAY, along with his most famous fictional super sleuth FELUDA and his associates TOPSE and JATAYU, enters the world of the testing for Covid-19.

Satyajit Ray's love for creating detective stories and science fiction comes to reality. FELUDA (***F***nCas9 ***E***ditor-***L***inked ***U***niform ***D***etection ***A***ssay) is India's indigenous first paper-strip test that uses cutting-edge CRISPR gene-editing technology to detect the SARS-CoV-2 virus accurately and quickly. The Feluda test kit was tweaked to detect the mutated variants of the virus and was aptly named as ***RAY*** (***R***apid variant ***A***ssa***Y***). Next came the app ***TOPSE*** (***T***rue ***O***utcome ***P***redicted via ***S***trip ***E***valuation) that photographs the diagnostic paper strips with a smartphone and uses machine learning to accurately detect the presence of viral RNA. Finally, a web tool ***JATAYU*** (***J***unction for ***A***nalysis and ***TA***rget Design for ***Y***our FEL***U***DA Assay) completes the scenario. As anyone can guess that one of the scientists behind the scenes is a fan of Ray and Feluda: Dr. Debojyoti Chakraborty of India's Delhi-based research laboratory CSIR-IGIB. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8020606/)

Satyajit Ray - Fast Facts and Trivia

- Born to Suprabha and Sukumar Ray, Satyajit (Manik) was delivered on May 2, 1921 by none other than Dr. Kadambini Ganguly, formerly Bose (India's first female college graduate and one of the first female doctors of India; Kadambini was married to Sukumar Ray's maternal grandfather Dwarakanath Ganguly, a notable Brahmo reformer of Bengal). Sukumar Ray died when Satyajit was just over two years of age.
- Graduate of Presidency College in Economics (at the advice of the famous Statistician Prashanta Chandra Mahalanobis).
-

Commemorating Satyajit Ray Birth Centenary

- Got married (by registration) to Bijaya Das on October 20, 1948
- in Bombay: Brahmo wedding followed in Calcutta on March 3, 1949 officiated by Kshitimohan Sen (a close associate of Rabindranath and also grandfather of Amartya Sen).
- Tagore's famous poem, বহুদিন ধরে বহুক্রোশ দূরে (Bohudin dhore) was an autograph to Satyajit Ray in his brand-new autograph book when Ray as a child stayed at Santiniketan for three months with his mother Suprabha.
- Ray with wife Bijaya went to London for 6 months in 1950; went to continental Europe and attended Mozart's opera The Magic Flute in Salzburg, Austria. Mozart remained as Ray's most favorite composer.
- Ray started writing the screen play of *Pather Panchali* while on a ship returning from London in 1950.
- Ray designed four typefaces for roman script named Ray Roman, Ray Bizarre, Daphnis and Holiday script, apart from numerous Bengali ones for Sandesh magazine. Ray Roman and Ray Bizarre won an international competition in 1971.
- *Goopi Gayen Bagha Bayen and Sonar Kella* made Jaisalmer a ajortourist attraction especially for Bengalis.

Calcutta Film Society

Satyajit Ray along with Chidananda Das Gupta and others established Calcutta Film Society on October 5, 1947. Famous Statistician Prasanta Chandra Mahalanobis, a close friend of Sukumar Ray was its first President.

Close Encounter and Personal Notes

1. **My memorable visit to Satyajit Ray's home**

My visit (along with my sister who knew Ray and Bijaya Ray well) to 1/1 Bishop Lefroy Road in 1986 was brief but *magical*. It was in the room in which he was photographed many times. His was an impressive operatic bass-baritone voice that matched his towering figure. While we were there, a person from *Sandesh* came and collected his article with his hand-drawn sketches for the next issue. After our brief visit, Ray and Bijaya Ray walked along with us up to their front door (later I read that they always did that to their guests). To my whispered question, "How tall is Manikda", Bijayadi replied "6 ft. 4 inches". Before leaving, I requested an autograph and he obliged. It said in Bengali "Antorik Shubhechhay, Satyajit Ray" and dated January 29, 1986.

2. **"Kanchenjungha" buzz at the Presidency College in 1961**

"*Hark ye all*, Satyajit Ray chose Alakananda Roy for his next movie. It will be filmed in Darjeeling." At that time Alakananda was studying B.A. (with English honors) in Presidency College (which happens to be Satyajit Ray's alma mater too). "Which one is Alakananda? Can you point her to us?"

Some of us B.Sc. Physics honors students were mostly "cooped up" in the Baker Laboratory building of the college and did not know her or had any common classes with her. She became "famous" in the college within a few days. The shooting took place mostly during the Durga Puja vacation (Oct/Nov 1961) we were told. In a dialogue in the movie, she identified herself as a student studying in Presidency College.

3. The Maholanobis connection

My father Samarendra Kumar Mitra met Satyajit Ray and wife Bijaya in 1950 at a dinner in a London restaurant hosted by Professor Mahalanobis. At that time, Ray was affectionately "known" only as Sukumar Ray's son. Upon his return from London Ray started working on *Pather Panchali* and my father joined Indian Statistical Institute (ISI) where he remained until his retirement. Many years later, my father met Satyajit Ray in 1986 in Ray's Bishop Lefroy Road apartment and they both remembered vividly their meeting in London, including the name of the restaurant.

In December of 1955, Premier Bulganin and the First Secretary and the First Secretary of the Communist Party of the Soviet Union. Nikita Krushchev were scheduled to visit ISI (Professor Mahalanobis was the Head of the Institute) but the trip was cancelled for safety reasons as a wild crowd along the road from the airport to the Raj Bhavan tried to shake hands with the dignitaries. As the disappointed gathering in the lawn of ISI was dispersing, my mother quickly spotted Satyajit Ray standing taller than the most and told me "Look, that's Satyajit Ray". By that time in 1955 *Pather Panchali* was a successful movie and Ray became an iconic figure in his own right.

Ray and Rajshekhar Basu/Parashuram: the two multifaceted genius

Both started writing in their forties. Both were reserved and profound thinkers but created humous stories/characters and very witty dialogues. *Gagan-chati* by Basu was a humorous science fiction story. Ray met Rajshekhar Basu (a chemist by profession) personally when he made his movie *Parash pathar* (The Philosopher's stone) based on a story by the latter. Subsequently Ray made another movie *Mahapurush* based on Basu's story *Birinchi Baba* about a fake guru. Ray's "Jai baba Felunath" also has a similar fake guru, Machhli Baba. In 2015 (centenary of the magazine *Sandesh*), many old covers of *Sandesh* were discovered in the storeroom of a house where Rajshekhar Basu once lived. Many drawings and some unpublished writings by Rajshekhar Basu were also discovered in the process. (http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/46995298.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst)

Commemorating Satyajit Ray Birth Centenary

Ray on *Pather Panchali*

"I chose *Pather Panchali* for the qualities that it made it a great book: its humanism; its lyricism and its ring of truth".

"When I began *Pather Panchali,* I was aware of the consequences of departing from the beaten track; …the film was half finished, and our money ran out."

Incidentally, West Bengal Government under the Chief Minister Dr. B.C. Roy (who was a Brahmo) financially rescued the project; the story goes that in the record the money was given under the category of "road improvement" perhaps because the English title of the film was *Song of the Road.*

In 1966, "Pather Panchali could never be made now because Chunibala is no longer there".

A Few Quotes by Ray:

About Rabindranath Tagore to Andrew Robinson "If you recorded his normal conversation it would sound like a prepared speech. Everything was so incredibly perfect… As a composer of songs, he has no equal, not even in the West".

"The Thief of Baghdad, and Douglas Fairbanks Senior was my first idol".

To his future Art Director Bansi Chandragupta in 1950: "Venice is a fantastic place - very reminiscent of Benares in some ways, and equally photogenic". Subsequently Satyajit Ray would use and Jai Baba Benaras as the backdrop for his two films *Aparajita* of Apu trilogy and *Jai Baba Felunath.*

"When I write an original story, I write about people I know first-hand and situations I'm familiar with".

"I wouldn't mind taking a rest for three or four months, but I have to keep on making films for the sake of my crew, who just wait for the next film because they're not on a fixed salary."

About Subroto Mitra who was only 21 and did not operate a movie camera until he joined Ray's team: "My cameraman and I devised a method, which we started using from my second film, which applies mainly to day scenes shot in the studio, where we used bounced light instead of direct light".

When I'm shooting on location, you get ideas on the spot -- new angles. You make, not major changes but important modifications, that you can't do on a set. I do that because you have to be economical."

"*Jalsaghar, Devi, Kanchanjungha* were all written with Chhabi Biswas in mind".

Soumitra Chatterjee – the model for Feluda once asked Ray whether he kept himself in mind when he sketched the character of Feluda. Ray quipped back, "Why people tell me I do it keeping YOU in mind!"

Commemorating Satyajit Ray Birth Centenary

Other Film Directors on Ray

The legendary Japanese filmmaker **Akira Kurosawa**, director of *Rashomon* and *Seven Samurai* to Andrew Robinson: "The quiet but deep observation, understanding and love of the human race, which are characteristic of all his [Ray's] films, have impressed me greatly... Not to have seen the cinema of Ray means existing in the world without seeing the sun or the moon".

Martin Scorsese, Director of *Taxi Driver* and *Raging Bull*: "for me he is the filmic voice of India, speaking for the people of all classes of the country…He is the most sensitive and eloquent artist".

Majid Majidi, the Iranian director of the acclaimed movies *Children of Heaven* and *The Color of Paradise:*

"I knew India from Satyajit Ray's cinema …In *Pather Panchali*, there is a respect that he has for his hero, even in the poverty. His heroes come from this class of society, and they are trying for life," in an interview with PTI, 2018).

Satyajit Ray's Letters from Santiniketan to his mother Suprabha discovered

Recently Sandip Ray came across a rare collection of some 50-odd letters, mostly postcards, giving a glimpse into the mother-son relationship, and his days as a student under Nanadalal Bose in Santiniketan. Stay tuned…

Postscript: Feluda Prodosh C. Mitter in R.C. Mitter's House

A few scenes, including the last scene of the telefilm based on Satyajit Ray's Baksho Rahasya, was filmed in 1996 by Sandip Ray at my Calcutta home built by my grandfather R.C. Mitter. Years later, I saw the film. It was rather amusing to watch the scenes shot in the library room adorned with its grandfather clock (it struck Five in the film) in the home where I grew up. My sister's black Doberman Pinscher was also shown in the movie.

Disclaimer

The light-hearted material presented here is the author's choice for this magazine. In this age of information explosion, one can find many interesting books, articles and interviews on Youtube related to Satyajit Ray that continue to be produced.

References

1. *Our Films, Their Films* by Satyajit Ray. Hyperion New York 1994
2. *Satyajit Ray The Inner Eye* by Andrew Robinson University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1989.
3. *Travails with The Alien -The Film That Was Never Made And Other Adventures with Science Fiction Satyajit Ray* Edited by Sandip Ray. HyperCollins Publishers, 2018
4. সেরা সত্যজিৎ: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯১ (Best Of Satyajit: Ananda Publishers Private Limited, 1991)

5. আমাদের কথা- বিজয়া রায় (Our Story by Bijaya Ray); Ananda Publishers Private Limited; 5th Edition 2011.

6. সিনে টেকনিক (সত্যজিৎ রায় বিশেষ সংখ্যা), সম্পাদনা দিলীপ ব্যানার্জী সোমেন ঘোষ; দ্বিতীয় সংখ্যা, মার্চ ১৯৭২ (Cine Techniques Special Edition on Satyajit Ray; ed. Dilip Banerjee and Somen Ghosh, March 1972).

Audrey

Amrita Dasgupta

Her lips are scarlet, her eyes are blue,
She is so graceful, she is so true.
She has a charm that turns me on,
She runs from me just like a fawn.
Ebony hair and cheeks that blush,
I think on her I have a crush.
She looks at me with eyes so cool,
I turn away, feel like a fool.
Diamonds, rubies, gems or gold,
Could never quench our love so old.
Audrey, Audrey speak to me,
Speak to me or set me free.
But then one day she went away,
She isn't here with me today.
My love Audrey left this world,
The night was cold, the fair winds whirled.
Who could have slayed a love so true,
Leaving me with such pain and rue.
Audrey perished left me cold,
My story is almost nearly told.
It happened while she was reading Macbeth,
Oh, why is there a thing called death?

January 3, 1982

Our Unsung Heroes

Anjali Bhattacharyya

With the invasion of Covid 19, we are pushed through an unimaginably impossible and unfathomably difficult uncharted path whose margin expands continuously towards the unknown as we take every step. It has impacted every sphere of our lives.

We are depending and pressuring more and more on our physicians and other healthcare providers. We have a vague idea of the kind of pressure they are in, the kind of professional hazard they face every moment of the day. Several already have lost their lives in the battle. Yet no one shrinks from their duties and responsibilities. They are an inspiration of selflessness and sacrifice. They are our heroes.

We look up to the scientific community eagerly and impatiently for some miraculous drugs and vaccinations for combatting and winning this undeclared world war. We hope someday, sometime, somewhere there will be some miraculous drugs and vaccines. We look up to them. They are also our heroes.

In such critical times we depend on others to carry out our daily living as smoothly as possible. Without their services we could not survive even a day. Yet how much are we aware of their selfless sacrifices? How much do we appreciate them? How well do we recognize them? They are our unsung heroes!

Here is my small tribute in recognition and appreciation of their selfless services:

There you are Mr. Mailman,

From Monday through Saturday through rain or shine

You bring news and information, personal and private

To me.

Following your route through Covid and beyond!

And you at the (grocery) cash register,

From the garden supply to the pharmacy

Each day and every day

You supply our needs

At the base of our existence.

All year-round rain and shine
Remaining behind the scenes,
You keep our roads in optimal condition
Bridging the gap with the bonds of humanity.
You Mr. Sewage Man
You Mr. Trash Collector
You, Mr. Recycle Picker
You are mostly behind the scenes
Silent, yet diligent.
I usually do not talk to you
I do not much think about you
I take you for granted.
You are there for me and many like me
You are there all the time for all of us.

You are the inspiration of mankind
You are my unsung heroes!

The Pandemia

Anjali Bhattacharyya

My days and nights
I knew so well
With
Unspoken assurance of
Friendliness and familiarity,
Mundane and repetitious
Mutual exchange of
Words, sentences and paragraphs
Brimming with
Simplicity, clarity, friendliness and bonding.

Words and thoughts
Laced with
Fear, doubt, helplessness and isolation
Shoved into a margin of unknown dimension.

In the blinking of an eye
My known intimate world
Gets jumbled up with
Chapters and chapters of the unknown:
Clear and sunny mornings
Mutate into indignant, frustrated minutes and hours,
Nights threatened by violent nightmares
Hard sanitizers smeared over assurance
Disinfectants of all sorts
Spray unfriendliness and separation

On the doorknobs.
Fear tries to filter through face masks
Doubt forcefully forces through rubber gloves.

Unwilling, clueless and scared
I get pushed in an
Unknown sphere of
Endless hazy nebula.

Three Pieces of Banana Bread

Anjali Bhattacharyya

It is 2 pm on the dot
My doorbell rings and waits
Till I come hovering uncertainly over my slow cane
And open the door wondering and irritated.

There waits my friend
From right across the street
Smiling
A small paper plate in her hand.

She hands the plate over to me
Then leaves
Waving her gloved hand
And smiling through her mask.

Disinfecting the wrap
I look at three pieces of banana bread
That she had baked
With so much
Love, hope and sharing
Breaking down the isolation and all barriers!

প্রবাসে শরৎ ঋতু

অরুন্ধতী ঘোষ

আমাদের অন্যান্য ঋতুর মতোই আমাদের ভীষণ প্রিয় একটি ঋতু, শরৎ। প্রতি বছর শরৎ তার ঝুলি ভরতি করে আনে নানা উপহার আমাদের জন্য। নীল আকাশে তুলোর মতো মেঘের রাশি, গাছে গাছে ফুলের বাহার-শিউলি, রঙ্গন, টগর করবী ইত্যাদি, ভোরের শিশির ভেজা ঘাস ও পথের ধারে ধারে কাশফুলের গুচ্ছ।সেই কবে দেখা, কিন্তু তবু শরতের কথা উঠলে মনটা অনেক দূরে চলে যায়, সেই বাংলায়, যেখানে শিউলিফুল, জলের ওপরে ভাসা পদ্ম ও ঢাকির বাজনা, পাড়ায় পাড়ায় প্যান্ডেলে অধিষ্ঠিতা দেবী দুর্গার কাছে।

উত্তর আমেরিকায় কিন্তু দেশের মতোই বিভিন্ন ঋতু ঘুরে ফিরে আসে- বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও শীত। শরৎকালকে এদেশে আমরা "Fall" বলে থাকি। এইসময় সবুজ পর্ণমোচি গাছেদের পাতার রঙ বদলের ও পাতা ঝরানোর পালা।গাছেরা তাদের পাতা ঝরিয়ে শীতের চাদরে নিজেদের মোড়ে, আর বসন্তের প্রতিক্ষা করে। এই "Fall" এর সঙ্গে আমাদের দেশের শরৎ ঋতুর খুব একটা তফাৎ নেই। নীরব নীল আকাশে সাদা মেঘের সারি, ভোরের শিশিরে ভেজা ঘাস, অসংখ্য Fall flower, যা দিয়ে আমরা মা দুর্গাকে সাজাই, অঞ্জলি দিই।

এদেশে শরৎ আসে প্রকৃতিকে নতুনরূপে সাজাতে। একটু আগেই বলছিলাম গাছেদের পাতা ঝরানোর কথা। গাছেরা তাদের সবুজ পাতার রাশিকে হলুদ, কমলা, মেরুন, লাল নানা রঙ এ রাঙ্গিয়ে নেয়।যেন প্রকৃতিদেবী তাঁর রঙ ও তুলি দিয়ে নিজের খেয়ালে ছবি এঁকেছেন। প্রকৃতির এই রংখেলাকে আমরা "Fall Color"। এ যেন পাতার ঝরার আগে প্রকৃতির প্রোগ্রামের "Grand Finale" ।

এবার কাশফুলের প্রসঙ্গে আসি। কাশফুল ছাড়া শরৎ অসম্পূর্ণ। আমাদের প্রবাসে কাশফুল না থাকলেও আমরা দেখতে পাই "Fall Grasses"- অনেকটা কাশফুলের মতো দেখতে, তবে রকমভেদ আছে। রাস্তার ধারে ধারে অসংখ্য এইরকম শরতের ঘাস এদেশের শরতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য।

প্রকৃতির এই রঙের উৎসব, কাশফুলের মতো এদেশের শরতের ঘাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় আসন্ন দুর্গাপুজার কথা। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমরাও নিজেদের নতুন পোষাকে মুড়ে দুর্গাপুজায় মেতে উঠি।প্রবাসে মহালয়া শুনে দেবীপক্ষের শুরু হয় এবং বিভিন্ন শহরে দুর্গাপুজা পালিত হয় এক একটি উইকেন্ডে।

পাব না তোমায় জানি

বেনামী

পাব না তোমায় জানি ॥

তবু ভালো লাগে অলস শয়নে, ভাবিতে তোমায় আপনার মনে,
দোলা দিয়ে যায় মধুর স্বপনে, হাসিভরা মুখখানি ॥

তুমি রূপসিনী, তুমি বিদূষিনী, তবু পরকীয়া তুমি, জানাব না মন কভু ।
তুমি সুখে ভোর, আমিও তো সুখী, যে যার নিয়ত নিজ পথমুখী,
তবু চঞ্চল হয়ে ওঠে আঁখি, দেখা পাব যদি জানি ॥

মনে ছিল আশা তোমায় শোনাবো গান, তার বিনিময়ে চাই নি তো প্রতিদান ।
খুঁজিলাম কত চারিধার চেয়ে দেখি না কোথাও অপরূপা মেয়ে,
বৃথাই আমি যে যাই গান গেয়ে, শুনি না তো তব বাণী ॥

কাছে টান যবে দূরে যাই চলে ত্বরা, ফিরিয়া না চাই, দিতে চাই যবে ধরা ।
এ লুকোচুরির নাহি যেন শেষ, কতটা বুঝিছ নাহি জানি লেশ,
লাজে ভয়ে মরে হেন প্রেমাবেশ, পাছে হয় কানাকানি ॥

তোমার প্রসাদ মাগে কত গুণী প্রাণ, তোমার বীণায় বাজে কিগো মোর গান?
গভীর নিশীথে পলকের তরে, আমায় যদি হে কভু মনে পড়ে,
সার্থক আমি ভাবিব আমারে, ওগো মোর গরবিনী ॥

পাঠকের চোখে কৌতূহলের ছবি, বেনামে লিখিছে এ কোন্ প্রেমিক কবি?
আঁকিতেছি আমি সবারই বারতা, ঘটিতেছে যাহা সমাজেতে সদা,
প্রকাশিতে ভয় হেন প্রেমকথা, হবে সম্মানহানি ॥

(পৃথ্বীশ দাশগুপ্ত’র অপ্রকাশিত লেখা, সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯৯২)

খেলা ভাঙ্গার খেলা

ভারতী মিত্র

এ গল্পের শুরু ১৯৫৮/৫৯ - এইরকম সময়ে - অর্থাৎ কিনা আমার ছেলেবেলায় – যখন আমি কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকায় বড় হচ্ছিলাম |

শীলাদি এক ধমক দিল মোনাকে... "হচ্ছেটা কি? বারবার দেখিয়ে দিচ্ছি, তাও ভুল করছিস?"

মোনা কতকটা কাঁদো কাঁদো মুখে ঘরের এককোণে গিয়ে দাঁড়ালো।

"ও কী? সরে গেলেই হবে? আবার চেষ্টা করতে হবে না? এদিকে আয় বলছি!"

মোনাকে দেখে মনে হোল, এক্ষুণি ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলবে।

কেঁদে ফেলতও, যদি না আলপনাদি মাঝে পড়ে বাঁচিয়ে দিত। স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টি অথচ দৃঢ় গলায় বলে উঠল আলপনাদি– "কিছুক্ষণের জন্য একটু ব্রেক দিলে ভাল হয় না? একটু নার্ভাস হয়ে গেছে মনে হয়।" বলেই মোনাকে দুহাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে একটু হেসে বল্লে, "আয় একটু জল খাবি আয়... এতক্ষণ ধরে প্র্যাক্টিস করে করে গলা শুকিয়ে গেছে নিশ্চয়!"

শীলাদি অগত্যা এবারে অন্য নাচের মেয়েদের দিকে মনোযোগ দিল। বেলাদি, যে কিনা তার ছোটবোন শীলার চাইতে অনেক বেশী বুঝদার, ব্যাপার দেখে স্রেফ একটু মুচকি হাসল। পাড়ায় পঁচিশে বৈশাখের প্রোগ্রামের জন্য রিহার্সাল চলছিল – ঋতুরঙ্গ - শীলাদি খুব ভালো নাচত, তাই সেই ড্যান্স ডিরেক্টর – আর তার দিদি, বেলাদি, গানের দিকটা দেখছিল।

আমরা সবাই শীলাদির মেজাজকে অল্পবিস্তর ভয় পেতাম। বেলাদিও সোজাসুজি প্রতিবাদ করতে সাহস পেত না সেটা দেখতাম। কিন্তু আলপনাদির ব্যাপারই আলাদা। সে কারোক্কেই পরোয়া করত না। অন্যায় হচ্ছে দেখলেই তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করত।

আমাদেরই বাড়ির নিচের তলার দুটি ফ্ল্যাটে এরা ভাড়া থাকত... একতলায় বেলাদি, শীলাদি, তাদের চার ভাই এবং বাবা-মা। আর আমাদের দোতলার ফ্ল্যাটে থাকতেন জাঁদরেল অ্যাডভোকেট রায়চৌধুরী-মশাই, তাঁর ততোধিক জাঁদরেল মিসেস -মৃদুলা দেবী, মেয়ে আলপনা, আর দুই ছেলে নাড়ু আর বাবু।

আলপনাদিরা যখন আমাদের পাড়ায় প্রথম আসে তখনও সে স্কুল-পড়ুয়া। মোটা মোটা দুই বিনুনী ঝুলিয়ে স্কুলে যেত। অ্যাডভোকেট রায়চৌধুরী খুব মেজাজী লোক ছিলেন। তাঁর নিজের গাড়ীতে করে স্কুলের দোরগোড়ায় মেয়েকে পৌঁছে দিতেন... মেয়ের একা একা এদিক ওদিক হুটহাট করে ঘুরে বেড়ানো এক্কেবারে পছন্দ করতেন না। যথাসম্ভব চোখে চোখে রাখতেন মেয়েকে।

স্কুলের উঁচু ক্লাসে উঠেই আলপনাদি ঠিক করে ফেলেছিল যে সে ডাক্তারি পড়বে - দশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে। বেলাদিরা যখন আমাদের একতলাটা ভাড়া নিয়ে এলো, আলপনাদি তখন অলরেডি মেডিকেল কলেজে প্রথম বছরের ছাত্রী।

তার সহজাত সপ্রতিভ হাবভাব যেন আরও এক মাত্রা পেয়েছিল ডাক্তারি কলেজে ঢুকে। সবসময়েই ব্যাস্তসমস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতো। যদি কেউ বলত, ভাবী ডাক্তারের মতই লাগছে তোকে, সে হেসেই উড়িয়ে দিত। খুর চটকদার চেহারা থাকা সত্ত্বেও সবসময় সরু পাড় সাদা শাড়ী পরত আলপনাদি – কেন, কেউ জানে না।

অসাধারণ আলাপী এহেন আলপনাদি একদিন একরকম ওপরপড়া হয়েই একতলার নতুন বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ করতে চলে গেল - হাতে একটি সুন্দর ট্রে - তাতে বেশ কয়েকটি পাটিসাপ্টা - একটি লেসের সুদৃশ্য রুমালে ঢাকা। জ্যাঠাইমা, মানে বেলাদির মা, খুবই খুশি হয়ে আপ্যায়ন করে আলপনাদিকে বসিয়েছিলেন। বেলাদি আর শীলাদিও এসে বসেছিল, কথা বলেছিল, কিন্তু ছেলেরা যে যার এদিক-ওদিক লুকিয়ে ছিল, সামনাসামনি আসেনি। শীলাদির পরের ভাই সৌরীনের সঙ্গে তাই আলপনাদির তেমন ভাবে রীতিমত আলাপ কখনও হয়নি। তবে আলাপ হোল, একটু অস্বাভাবিক ভাবেই, সেই কথাতেই আসছি।

একদিন হুড়মুড় করে স্বভাবসিদ্ধ গতিতে একপ্রকার ছুটেই সিঁড়ি দিয়ে নামছিল আলপনাদি… আর সৌরীনদা উঠছিলেন সিঁড়ি বেয়ে আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে – বাবা ডেকেছিলেন কী এক বিশেষ কারণে। হঠাৎ এক আচমকা কলিশনে সৌরীনদার চওড়া বুকের মধ্যে আকস্মিকভাবে প্রায় সেঁধিয়ে গিয়ে আলপনাদির মত স্মার্ট মেয়েও লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল – কপালে দেখা দিয়েছিল বিন্দু বিন্দু ঘাম – ওঃ সরি! আ – আ – আমি দেখতেই পাই নি!

রিফ্লেক্স অ্যাকশনে নিজের অজান্তেই দুহাতে জড়িয়ে ধরেছিল মেয়েটিকে সৌরীনদা – এখন আস্তে করে হাত সরিয়ে নিয়ে এমনভাবে হাতদুটি ওপরদিকে ছড়িয়ে দিল, যেন কেউ ওর দিকে বন্দুক তাগ করে 'হ্যান্ডস আপ" বলেছে। হেসেও ফেলল – বলল, "এত হুটোপাটি করে নামলে কি আর দেখা যায় কেউ ওপরে উঠছে কি না?"

আলপনাদি ততক্ষণে নিজের অপ্রতিভ ভাবটা সামলে নিয়েছে – পালটা চার্জ করলে, "আপনিও তো দেখতে পারতেন, কেউ আসছে কি না… "

"হুম, আপনিই কিন্তু উড়ে এসে আমার ওপর পড়লেন… আমি আস্তেই উঠছিলাম – এক পা এক পা করে।"

"অসম্ভব!"

"যাই হোক – আমি ঝগড়া করতে পারি না" হ্যান্ডশেকের হাত এগিয়ে দিয়ে বল্লে সৌরীনদা – "আমার নাম সৌরীন – আপনি আমাদের ওপরতলার বাসিন্দা, তাই না? মাঝে মাঝে শুনি আপনার পিয়ানো বাজনা।"

আলপনাদিও কম যায় না, হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বল্লে – "হ্যাঁ আমি আলপনা – আপনাদের বাড়ীতে একবার গিয়েওছিলাম, কিন্তু আপনাকে ত দেখিনি!"

সৌরীন – "হ্যাঁ - আপনাকে দেখে তখনই ভয় পেয়েছিলাম, তাই লুকিয়ে পড়েছিলাম।"

সৌরীনের হাসি দেখে আর কথা শুনে গা জ্বলে গেছল আলপনাদির। "হুঁঃ" বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেছল সেদিনকার মতন।

সেই শুরু।

তারপর থেকে মেইলবক্সের সামনে, সিঁড়ির মুখে, গলির মোড়ে, ট্রামরাস্তায়, এখানে-ওখানে প্রায়শঃই দেখা হতে লাগল দুজনের। একই পাড়ায় – উপরন্তু একই বিল্ডিংয়ে - থাকলে যা হয় আর কি!

প্রথম প্রথম তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে একবার তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছিল আলপনাদি, কিন্তু সৌরীনদার সহজ নির্মল হাসি, দুষ্টুমি ভরা চোখ এবং চটুল মন্তব্য খুব বেশীদিন অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয়নি। আলপনাদিও চেষ্টা করত মুখের মতন জবাব দেবার। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অসফল হোত। তাতে বাহ্যত বিরক্তি প্রকাশ করলেও মনে মনে মজা পেত আলপনাদি, আর মহড়া দিতে থাকত – পরের দিন দেখা হলে কী বলবে। অর্থাৎ নিজের অজান্তেই পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে সৌরীনদার কথা মনের মধ্যে ঘুরপাক খেত।

সৌরীনদার জন্যে মহড়া দিয়েও অবশ্য কোনো লাভ হোত না। প্রতিদিনই এমন অভিনব কিছু না কিছু বলত সৌরীনদা, এমন সব মন্তব্য হাওয়ায় ছুঁড়ে দিত, যার উত্তর খুঁজে পেতে আলপনাদির মত স্মার্ট মেয়েকেও বেশ বেগ পেতে হোত।

এমন সময় ঘটল ঘটনাটা। উল্টোদিকের বাড়ীর সমীরণের কাকার হঠাৎ মধ্যরাত্রে স্ট্রোক হোল। পাড়ায় সোরগোল উঠল। ওই অত রাতেও সবার আগে এক ছুটে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে গেল যে লোকটি, সে কিন্তু সৌরীনদা। ঝট করে এক বন্ধুকে ফোন করে দিল – সে মিনিটের মধ্যে গাড়ী নিয়ে হাজির। সমীরণের কাকাকে তাই খুব তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া গেল এবং সে যাত্রা তিনি প্রাণেও বেঁচে গেলেন… স্বাস্থের তেমন কোনও স্থায়ী ক্ষতিও হোল না।

পাড়ার বয়োঃজ্যেষ্ঠরা সৌরীনদার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন – এতটা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এর আগে তাঁরা কখনও দেখেননি একথাও বারবার বলতে লাগলেন। কিন্তু সবচাইতে ইম্প্রেসড হোল আলপনাদি। তার পর থেকে মাঝে মাঝেই এইরকম সব তাক লাগানো অর্থহীন অথচ স্বতঃস্ফূর্ত কান্ডকারখানা ঘটাতে লাগল সৌরীনদা। পাড়ার একটি বাচ্চা একটা উঁচু পাঁচিল থেকে পড়ে গেল, সৌরীনদা কোত্থেকে ছুটে এসে তাকে কোলপাঁজা করে বাড়িতে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে নিজেই গেল ডাক্তার ডাকতে। পঁচিশে বৈশাখে প্যান্ডেল বেঁধে অনুষ্ঠান হবে পাড়ায় – দেবব্রত বিশ্বাস আসবেন গান গাইতে। স্টেজ সাজাবার সরঞ্জাম আনতে সৌরীনদাই ছুটল বাজারে। পাড়ার জনাকয়েক ছেলেছোকরা মিলে স্টেজ সাজালো সে রাতে, তাও সেই সৌরীনদার নেতৃত্বেই।

কার বেড়াল গাছের মগডালে উঠেছে, তাকে মই ঠেসান দিয়ে আস্তে করে কোলে নিয়ে নামাতে সৌরীনদা। কার বাড়ীতে স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে ধুন্ধুমার ঝগড়া বেধে গেছে, পাড়ার লোক নিজেদের বারান্দা থেকে মজা দেখছে, কিন্তু মধ্যস্থতা করে ঝগড়া থামাতে সৌরীনদা। এক রোববার পাশের পাড়ার ছেলেরা আমাদেরই পাড়ার ক্যাসানোভা বকুলদাকে তাদের পাড়ার মেয়েকে লাইন দেবার অভিযোগে হকি স্টিক নিয়ে দল বেঁধে মারতে এলো। ওই মারকুটে গুন্ডাদের মাঝখানে বড়রাও কেউ সাহস করলে না যেতে। কিন্তু সৌরীনদা অম্লানবদনে মাঝখানে পড়ে ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দিল।

পরের দিন আলপনাদি অভিযোগ করলে, "হাতজোড় করে গুন্ডাগুলোর কাছে ওই বখাটে ছেলেটার জন্য ক্ষমা চাইতে লজ্জা করল না আপনার? নাহয় খেতই কয়েক ঘা – ওর মত ছেলের মার খাওয়াই দরকার।"

"নাঃ – দুচার ঘা মার খাওয়া এক কথা আর হকিস্টিকের বাড়ি খেয়ে মাথা ফেটে হাসপাতালে পড়ে থাকা অন্য ব্যাপার। আমি বেঁচে থাকতে আমার পাড়ার কারুর ওরকম ক্ষতি হতে দিতে পারিনা।"

"ওফ!" বলল আলপনাদি, "আপনার সবতাতেই বেশি বেশি" – কিন্তু যেরকম মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকালো তাতে

বোঝাই গেল, সৌরীনদার ব্যবহারে সে বিরক্ত ত নয়ই, বরং গর্ব অনুভব করছে।

এইভাবেই আস্তে আস্তে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল এই দুটি যুবক-যুবতী। আমার যদিও তখন বছর দশেক বয়েস, এবং রাহুল দেব বর্মণ তার বহু পরে, অন্ততঃ বছর আষ্টেক পরে, তাঁর "মনে পড়ে রুবি রায়" গানটি গেয়ে সবার মন জয় করেছিলেন, এমনকি ফ্র্যাঙ্কি ভ্যাল্লিও তার "মায় আয়স অ্যাডোরড ইউ " গানটি রচনা করেছিলেন এ ঘটনার বছর ছয়েক পরে, কাজেই এসব গানের কোনো কথা সেই সময়ে আমার মনে পড়ার কথা নয়, কিন্তু খুব মিষ্টি লাগত আর মনটা কেমন আনন্দে নেচে উঠত যখন দেখতাম বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে আসছে আর আলপনাদি তার ক্লান্ত পা-দুটি টেনে টেনে আস্তে আস্তে হেঁটে মেডিকাল কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছে – আর তার পাশে পাশে গল্প করতে করতে হেঁটে আসছে সৌরীনদা – কাঁধে তার আলপনাদির ভারী ব্যাগখানা – ডাক্তারী বইপত্তরে বোঝাই।

বড় হয়ে যাবারও অনেক পরে, যখনই আলপনাদি আর সৌরীনদার কথা মনে পড়ত তখনি গানদুটির কথাগুলি – রাহুলের "বাস থেকে তুমি যবে নাবতে, একটি কিশোর ছেলে একা কেন দাঁড়িয়ে – সে কথা কি কোনও দিন ভাবতে" – কিংবা ফ্র্যাঙ্কি ভ্যাল্লির – "ক্যারিড ইয়োর বুকস ফ্রম স্কুল অ্যান্ড আই মেড বিলীভ ইউ আর ম্যারিড টু মী" ...ইত্যাদি।

আমি সম্ভবতঃ ছোটবেলা থেকেই একটু রোমান্টিক ধরণের ছিলাম। তাই এই দুটি মানুষ, যাদের আমি খুব ভালবাসি, তারা পরস্পরের প্রেমে পড়ে গেছে দেখে আমার কেমন এক অপার আনন্দ হোত।

বলাই বাহুল্য, সারা পাড়া ঐ সময়টায় ওদের এই প্রেমের কহানী নিয়ে গুজগুজ ফুসফুস চালাচ্ছিল। অ্যাডভোকেট রায়চৌধুরীর কানেও ক্রমে ক্রমে উঠে পড়ল কথাটা। তারপরে মাঝে মাঝেই আমাদের দোতলা থেকে ঝগড়াঝাঁটি, চেঁচামেচির আওয়াজ কানে আসত। আলপনাদিকে বাবা মা দুজনে মিলেই বকছেন আর সেও ছেড়ে দেবার পাত্রী নয় – সেও একদফা পালটা জবাব দিচ্ছে – এবং তারপরই ধুপধাপ দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ – বোঝা যেত শেষ পর্যন্ত আলপনাদি রণে ভঙ্গ দিয়ে ছুটে গিয়ে রাগ দেখিয়ে নিজের শোবার ঘরের দরজা শব্দ করে বন্ধ করছে।

পরের দিন আলপনাদি কলেজ যেত যখন, দেখতাম কান্নায় দুচোখ ফোলা – এবং তা ঢাকতে অনেক সময় মেঘলা দিনেও রোদচশমা পরে বেরোত সে। বড্ড কষ্ট হোত। মাকে বলেছিলাম, "মা, বলো না গিয়ে কাকাবাবু আর কাকিমা্কে বুঝিয়ে..." কিন্তু আমার মা বলতেন ওদের পারিবারিক ব্যাপার থেকে আমাদের সবার দূরে থাকাই ভালো।

যথা সময়ে আলপনাদি ডাক্তারী পাশ করল। পাড়ার সবাই আশা করেছিল, অ্যাডভোকেট রায়চৌধুরী হয়ত ধুমধাম করে পার্টি দেবেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেল সে সব কিছুই হোল না। আমি মায়ের আপত্তি না মেনে একদিন ভয়ে ভয়ে কুঁই কুঁই করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "ব্যাপার কি?" আলপনাদি গম্ভীর গলায় বলেছিল, "ব্যাপার আর কি হবে? মা-বাবার মত নেই। সৌরীন স্কুল পাশ করেছে এবং বছর দুয়েক সিটি কলেজে পড়েছেও, কিন্তু পাশ তো করতে পারেনি। চাকরী নেই বাকরী নেই, চাকরী পাবার সম্ভাবনা বা ইচ্ছেও নেই - শুধু পরোপকার করে তো আর পেট চলে না!"

আমি ততদিনে তের বছরেরটি হয়েছি, খানিকটা বুঝতেও শিখেছি। বল্লাম, "তা তুমি যখন জাঁকিয়ে ডাক্তারী করবে তখন ত তোমার চাকুরে বরের কোনও দরকার করবে না। তুমি ত তখন একাই একশো!"

আলপনাদি বলল, “সে কথা বাবাও জানে, কিন্তু এক্ষুণি তো আর তা হচ্ছে না।”

বল্লাম – “তা একমাত্র মেয়েকে কাকাবাবু কেরিয়ারের প্রথম দিকে কয়েকটা বছর নাহয় সাপোর্ট করলেনই বা। তাতে ক্ষতি কি?”

“কি জানি, বাবার জাস্ট জামাই হিসেবে ওকে পছন্দই হয়নি। কোন রাজপুত্তুরের আশায় যে বাবা বসে আছে তা কে জানে!”

“তো, তাহলে কী করবে এখন তোমরা?”

“জানিনা। এসব কথা অন্য কারুর সঙ্গে আলোচনা করিস নি যেন! খুব পাকু হয়ে উঠেছিস আজকাল।“

একটু দুঃখ পেয়েছিলাম। আলপনাদি কি জানেনা, আমি তাকে এবং সৌরীনদাকে এক্কেবারে নিজের মনে করি? নিজের মানুষজনের সম্বন্ধে কেউ কখনও বাইরের লোকের সঙ্গে আলোচনা করে নাকি?

এরই মাস চারেকের মাথায় জানা গেল হঠাৎ আলপনাদি বাড়ী থেকে নিখোঁজ। আগের দিন বন্ধুর বাড়ীতে পার্টি আছে, ফিরতে রাত হবে, বলে বাড়ীর চাবি নিয়ে গেছল। কিন্তু পরের দিন সকাল থেকে ওকে কোত্থাও পাওয়া যায়নি। বাড়ীতে ত ফেরেই নি। শুনে প্রথমেই মনে হয়েছিল, সৌরীনদাকে ব্যাপারটা জানানো দরকার। কেউ পারলে সেই পারবে সাহায্য করতে। কাউকে কিছু না বলে এক দৌড়ে নিচে একতলায় নেমে গেছলাম।

সৌরীনদাদের ফ্ল্যাটের দরজায় কড়া নাড়তে জ্যেঠাইমা এসে গম্ভীর মুখে দরজা খুলে দিলেন। বল্লাম, “সৌরীনদা কোথায়?” জেঠাইমা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে উদ্গত কান্না রুখতে ভেতরে চলে গেলেন। জেঠু বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখে রুক্ষগলায় বল্লেন,“কেন? সৌরীনকে তোমার হঠাৎ কি দরকার পড়ল, ডেঁপো মেয়ে!?”

আমি ত অবাক! আমতা আমতা করে বল্লাম, “আসলে আলপনাদিকে পাওয়া যাচ্ছে না ত, তাই ভাবলাম… “

জেঠুকে এত রেগে যেতে কোনওদিন দেখিনি – রাগে মুখ লাল করে কী একটা বলতে গেলেন, কিন্তু কিছু না বলে দুম করে আমার মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। আমার গলায় কান্না আটকে এল। এমন রূঢ় ব্যবহার এর আগে আমার সঙ্গে পাড়ার কেউ করেনি। ছুট্টে ওপরে গিয়ে নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে কাঁদতে লাগলাম। একটু পরে মা ঘরে ঢুকে সব শুনে বল্লেন, “আলপনা সম্ভবতঃ সৌরীনের সঙ্গেই পালিয়ে গেছে, কারণ সৌরীনও নাকি গতকাল রাত থেকে বেপাত্তা।“

শুনে আনন্দে, উত্তেজনায় বিছানায় উঠে বসলাম। মা বল্লেন, “বুঝতে পারছি তুমি এ-ব্যাপারে খুশী হয়েছ, কিন্তু একথা কিন্তু কাউকে জানানো চলবে না যে তুমি খুশী হয়েছ, এমনকি বাবাকেও নয়। ব্যাপারটা কিন্তু খুবই গুরুতর। তুমি যেমন রোম্যান্টিক অ্যাঙ্গেল থেকে ব্যাপারটা দেখছ, তেমন কিন্তু আর কেউ দেখবে না। তাই তোমাকে এইসব আলোচনার মাঝে গম্ভীর মুখে চুপ করে থাকতে হবে। বুঝেছ? এর যেন অন্যথা না হয়!”

মায়ের শাসানি উপেক্ষা করি এমন সাহস নেই। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “আচ্ছা মা, ওরা কি বিয়ে করবে?”

“তাই ত মনে হয়। তা না হলে আর পালাল কেন? দুপক্ষেরই বাড়ির মত ছিল না বলেই তো পালিয়ে গেল।”

কদিন পরে কানাঘুষোয় জানা গেল – আলপনাদির নামে ব্যাঙ্কে অ্যাডভোকেট রায়চৌধুরী নাকি অনেক টাকা জমা রেখেছিলেন, আলপনাদি তার সবটাই তুলে নিয়ে লন্ডন চলে গেছে সৌরীনদার সঙ্গে। তলে তলে সব জোগাড়যন্ত্র করে রেখেছিল আগে থাকতে – কাউকে কিচ্ছু জানতে দেয় নি। শুনে গর্বে, আনন্দে আমার নাচতে ইচ্ছে করছিল। তখন মায়ের শাসানিতে পাড়ার লোকজন ওদের বিরুদ্ধে কিছু বললেও কষ্ট করে চুপ করে থাকতাম। শুধু একবার মোনা কি যেন অপমানজনক একটা কথা বলেছিল আলপনাদির নামে, মনে আছে কষে এক চড় মেরেছিলাম, আর তাই নিয়ে মোনার সঙ্গে বহুদিনের জন্য আমার সম্পর্কটা একেবারেই চিড় খেয়ে গেছল।

এরপর বেশ কিছু বছর কেটে গেছে। আমি তখন কলেজে। একদিন দরজায় কলিং বেল শুনে ছুটে গিয়ে খুলে দিলাম। আমার এক কলেজের বন্ধুর পড়তে আসবার কথা ছিল। দেখি আলপনাদি দাঁড়িয়ে আছে একটি বছর তিনেকের ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ের হাত ধরে – পরণে লাল শাড়ী -কপালে সিঁদুর – অপরূপ মূর্তি। চেঁচিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরলাম। আলপনাদি হাসতে হাসতে ভেতরে চলে এলো সেই আগেরই মত – ইনফরমাল – আন্তরিক – মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল – ইলোরা – নাকি সৌরীনদার দেওয়া নাম। বল্লাম, “কই সৌরীনদা আসেনি?” “না রে - ও নতুন চাকরী পেয়েছে – ছুটি পেল না। এর পরের বার নিশ্চয় আসবে।” জিজ্ঞেস করতে সাহস হোল না, কী চাকরী করছে সৌরীনদা। খানিক পরে আলপনাদি নিজেই বল্ল – ওরই হাসপাতালে নার্সের কাজ করছে। “সব সময় মানুষের সেবা করতে চাইত যে লোক, তার পক্ষে এর চাইতে ভালো কাজ কী হতে পারে, বল?”

“তাহলে আবার নতুন করে কলেজে গিয়ে নার্সিং শিখতে হয়েছে বলো? “অবশ্যই – তবে চার বছর লাগল। একটু কষ্ট করতে হোল আমাদের, বিশেষ করে এরই মধ্যে ইলোরাও এসে গেল কিনা। কিন্তু এবারে একটু সুখের মুখ দেখা যাবে। তারপর – তোর কথা বল? কলেজ কেমন লাগছে? কেমন উড়ছিস? বয়ফ্রেন্ড হোল?”

“নাঃ”

“এত সুন্দরী হয়েছিস, এখনো ছেলেরা পিছু নিচ্ছেনা?”

কি আর বলি? অধোবদনে চুপ করে রইলাম। আলপনাদি ওদের তিনজনের ছবি দেখালো – লন্ডনে ওদের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে তোলা। সৌরীনদাকে ছবিতে খুব হ্যাপি দেখাচ্ছিল।

এর পরের বার যখন এলো আলপনাদি, আমি তখন সবে কলেজ পাশ করে চাকরী খুঁজছি এবং পেতে দেরী হচ্ছে বলে গোটা দুয়েক প্রাইভেট টিউশনি করছি। এবারে দেখলাম আবার সেই আগের মতন সরুপাড় সাদা শাড়ী পরণে। মুখখানা শুকনো। রায়চৌধুরীরা বহুদিন যাবৎ বেহালায় নিজেদের বাড়ী করে উঠে গেছলেন এবং পাড়ার কারোর সঙ্গে কোনও সংস্পর্শ রাখেননি। তাই আলপনাদির খবর একমাত্র আলপনাদি নিজে এলে তবেই পেতাম। আসত স্রেফ এ-পাড়ার সবার সঙ্গে দেখা করতে।

এবারে এসে বল্ল, “বাঁচাতে পারলাম না, জানিস, অনেক চেষ্টা করেছিলাম। একটা রেয়ার জেনেটিক ডিসীস – জানতাম না।”

আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। আমার হতবাক মুখের দিকে চেয়ে বলল, “আসলে তোকে প্রমিস করেছিলাম

না – তোর সৌরীনদাকে এবার নিয়ে আসব – তা আর হোল না। তোকে খুব ভালবাসত, জানিস?”

কোনও মতে ধরা গলায় বল্লাম, “কবে হোল এটা? কি করে হোল? তুমি এখন কি করবে?”

হেসে বল্ল, “দাঁড়া দাঁড়া, এক এক করে উত্তর দিই। এই মাসছয়েক আগে চলে গেল – তার আগে বেশ কিছুদিন যুঝেছে। খুব কষ্ট হোত দেখলে। অসহায় লাগত, কারণ কিছুই করতে পারতাম না। শেষের দিকে চাইছিলাম, চলে যাক, বিশেষ করে যখন বুঝতে পারলাম আমাদের আর কিছু করার নেই। লন্ডনের সব বড়বড় ডাক্তাররা ফেল পড়ে গেল, বুঝলি?” একটু থেমে বল্ল, “আর আমার কথা বলছিস? আমি ঠিকই থাকব। ইলোরাকে মানুষ করব। তাছাড়া আমার ডাক্তারী ত আছেই।”

বলেছিল ইলোরাকে নিয়ে আসবে একদিন লন্ডনে ফিরে যাবার আগে। সে সুযোগ আর হয়নি।

আনন্দ আশ্রয়

বিকাশ দাস

বন্ধু আমার অনেক

স্থান কাল পাত্র ভেদে,

প্রত্যেকেই অনবদ্য, বন্ধুরা আমার |

সে সময় চাকরির আকাল,

চাকরি পাওয়া ভার |

চেষ্টা চালিয়ে যাই - মেলে না,

হায় কোথা স্বান্ত্বনা !

কোনো এক দিন

ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে

বাবাকে জানাই

চাকরিটা হলো না ,

চুপ করে থাকে বাবা,

শুকনো মুখ, দু চোখে জলের ধারা,

বাবা যে বন্ধু আমার - বুঝেছি তখন||

নানা কাজের মাঝে,

ছোট বোন খুশি আসে, খিল খিল হাসে,

বলে, দাদা খেলো না আমার সাথে - লুকোচুরি খেলা,

অন্য কেউ খেলে না যে - আমি একা,

বোনটি আমার বন্ধু হয়ে গেল |

দাদার খেলার বল,

আচমকাই ফেলে দিই পুকুরের জলে,

দাদা যায় রেগে মারধর করে,

রাতে বিছানার পাশে দাদা এসে বসে

বলে, আমু,বড্ডো লেগেছে নারে?

আমি বলি নাগো দাদা লাগেনি আমার

বন্ধু পেলাম আবার ||

অন্য কোনো দিন রান্না ঘরে, উঁকি মেরে

দেখি - মার্ আধ-খাওয়া পাতে

মাছ নেই তাতে,

তবু প্রসন্ন মুখ, সুখ দুঃখে অবিচল -

আমার বন্ধু হয়ে মাগো থেকো চিরকাল ||

বয়স হয়েছে, কম দেখি চোখে

খাওয়ার সময়, সে আমার পাশে

কাঁটা বেছে চলে, পরম যতনে -

নিষ্কন্টক হতে হবে সুস্থ জীবনে,

সে যে অভিন্না বান্ধবী ||

ধরিত্রীর ভিন্ন ক্ষেত্রে, ভিন্ন প্রান্তে,

বিরাজিত বন্ধুরা আমার,

আনন্দের উৎস তারা,

বেঁচে থাকার মন্ত্র তারা জানে

সুখ দুঃখে ঘেরা, হাসি কান্নার এই পৃথিবীতে -

আমাদের পাশে, থেকে যাবে চিরদিন

আনন্দ আশ্রয় ||

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪)

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

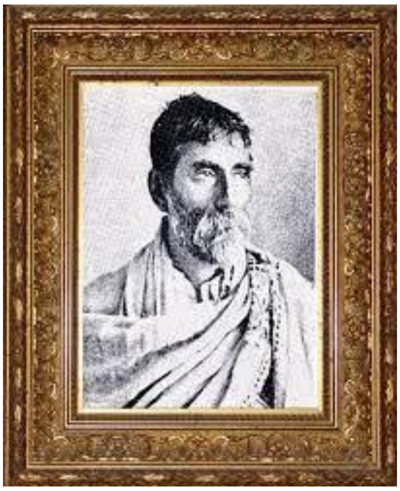

সারা বিশ্বে তথা ভারতবর্ষে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের রসায়ন বিদ্যার যে বিশাল অবদান সে আলোচনা করার ক্ষমতা বা শাস্ত্রাধিকার আমার নেই। তবে তাঁর কিছু লেখা পড়ে মনে হয়েছে তিনি ছিলেন একজন নির্ভীক, যুক্তিবাদী ও স্পষ্টবক্তা। অপ্রিয় সত্য বলতে তিনি কখনও দ্বিধা করতেন না। এই নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

স্পষ্টবক্তা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

যুক্তিবাদী ও মুক্ত চিন্তার পদাতিক আচার্য মহাশয় প্রায়ই কিছু অপ্রিয় সত্য কথা বলতেন, এবং জানতেন এতে কিছু লোক চটে যাবে। দু একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। তাঁর লেখা বিখ্যাত দু খন্ডের হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসে তিনি মনু আর শঙ্করাচার্যকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন । বইটির পাদটীকায় তিনি লেখেন শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ প্রচারের ফলে অনেক মানুষের মধ্যে থেকে পদার্থ জগৎ সম্বন্ধে জানা ও বোঝার আগ্রহই চলে গেল*। আবার মনু বিধান দিলেন যে মৃত ব্যাক্তিকে স্পর্শ করা পাপ। যাবতীয় শবই অস্পৃশ্য। এদিকে আমাদের সুশ্রুত সংহিতায় আছে মানুষের শরীরবৃত্ত জানার জন্য শবব্যবচ্ছেদ এক অতি জরুরী প্রক্রিয়া (আচার্য লিখেছেন "..According to Sus*ŕ*uta, the dissection of dead bodies is a ***sine quâ non*** to the student of surgery.." অর্থাৎ শল্যবিদ্যার শিক্ষার এক অতি প্রয়োজনীয় ও আবশ্যিক বিষয় হল শবব্যবচ্ছেদ। কিন্তু মনুর বিধান!! তাকে তো আর খণ্ডন করা যায় না। প্রফুল্লচন্দ্র রায় মনে করতেন যে এক প্রকার বাধার সম্মুখীন হল প্রাচীন ভারতের শল্যবিদ্যা ও পদার্থ বিজ্ঞানের অগ্রগতি। যদিও মনুর বিধান বা শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের ফলে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানের অগ্রগতি বাধা পেয়েছিল বলে সেরকম কোন পাথুরে প্রমাণ নেই।

জাতপাত নিয়েও তাঁর বক্তব্য খুব পরিষ্কার। প্রাচীন ভারতে মানুষের শ্রম এবং দক্ষতার ভিত্তিতে এর শুরু। কিন্তু অস্তগামী বৌদ্ধ যুগের পর ব্রাহ্মণ্যবাদের যেন নতুন করে এক উত্থান (de novo) হল, ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের আধিপত্য জারি করতে এক নতুন জাতপাত তৈরী হল - মানুষের দক্ষতার ভিত্তিতে নয় বরং তার জন্ম আর ঠিকুজি-কুলের ভিত্তিতে। আবার মার খেল প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানের অগ্রগতি।

মেঘনাদ সাহার "আচার্য স্মৃতি" থেকে একটা মজার ঘটনার কথা জানতে পারি: "স্যার পি, সি, রায় একবার পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু রসায়ন সম্পর্কে ভাষণ দেবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আহরণ করে তিনি দু'খন্ডে তাঁর সুবৃহৎ 'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস' রচনা করেছেন। এই গ্রন্থ তাঁর রসায়নশাস্ত্রে ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে সুগভীর পান্ডিত্যের পরিচায়ক। বহু পরিশ্রম করে তিনি বিজ্ঞানক্ষেত্রে ভারতের দান - যা প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তাই পুনরুদ্ধার করে জগতের সামনে প্রকাশ করেন। লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ভাষণ সভায় স্থানীয় কলেজের একজন অল্পবয়স্ক ইংরাজ অধ্যাপকও ছিলেন। তিনি তখন সবে ভারতবর্ষে এসেছেন। এখানকার সভ্যতায় বিশেষ আকৃষ্ট হননি। স্যার পি, সি, রায় প্রাচীন হিন্দুদের রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও সেই যুগের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে ছবি এঁকে ব্যাখ্যা করছিলেন। কতকগুলি মাটির ভান্ডের ছবি, যাহার নীচে জ্বাল দিয়ে উর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়া দ্বারা (sublimation) মকরধ্বজ ইত্যাদি তৈয়ারি করা হয়।

ইংরেজ যুবকটি তাচ্ছিল্যভরে নাক সিঁটকাচ্ছিলেন এবং হাসি সম্বরণ করতে পারছিলেন না। আচার্যদেব তা লক্ষ্য করে বিরক্ত হয়ে উঠলেন। যন্ত্রপাতির ব্যাখ্যা শেষ করে হাতে এক ডেলা মকরধ্বজ নিলেন। মকরধ্বজ হল রিসাব্লাইমড মার্কিউরিক সালফাইড। কবিরাজরা এখনও সেই প্রাচীন নিয়মেই মকরধ্বজ প্রস্তুত করেন। অনেক য়ুরোপীয় চিকিৎসকেরাও তা ব্যবহার করে থাকেন। বাংলা সরকারের সার্জেন জেনারেল স্যার পার্দি লুকিস অনেক সময় তাঁর রোগীদের উত্তেজক ঔষধ হিসাবে মকরধ্বজ খেতে দিতেন। মকরধ্বজের ডেলা হাতে নিয়ে তিনি বললেন - "বন্ধুগণ, আজ হতে দু হাজার বছর পূর্বে সেকেলে যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভারতবাসীরা এই অপূর্ব ঔষধ প্রস্তুত করে মানবের কল্যাণার্থে ব্যবহার করেছেন, রোগে শান্তি দিয়েছেন - এখনকার উন্নতর যন্ত্রপাতির সাহায্যেও এর চেয়ে বিশুদ্ধ Resublimed mercuric sulphide তৈয়ারি হয়নি। হিন্দুরা সামান্য মাটির ভান্ডে এরূপ বিশুদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্য তৈয়ারি করেছিলেন কোন্ সময়ে - প্রায় হাজার বছর পূর্বে যখন আমার ঐ বন্ধুটির (ইংরাজ যুবকটিকে দেখিয়ে) পূর্বপুরুষেরা পশুচর্মে লজ্জা নিবারণ করতেন এবং বন্য ফল খেয়ে জীবনধারণ করতেন।" এই কথা বলা মাত্র ভারতীয় শ্রোতারা করতালি দিয়ে উঠল। তরুণ ইংরেজ অধ্যাপক যুবকটি লজ্জায় লাল হয়ে সবেগে ঘর থেকে ছুটে পালালেন। পরে তিনিই স্যার পি, সি, রায়ের বিশেষ গুণগ্রাহী হয়ে পড়েন।"

ছেলেবেলা ও শিক্ষালাভ

১৮৬১ সালে কপোতাক্ষ নদীর তীরে রাড়ুলি কাঠিপাড়া গ্রামে (অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলায়) জন্ম প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের। লেখাপড়া শুরু গ্রামের পাঠশালায়, তারপর কলকাতায় এসে প্রথমে হেয়ার স্কুল ও পরে আলবার্ট স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৭৯ সালে আলবার্ট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করেন। তারপর তিনি মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ) থেকে ফার্স্ট আর্টস ও এফ. এ পরীক্ষায় পাস (১৮৮১) করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ পড়ার জন্য ভর্তি হন। সেই সময় গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেন। বৃত্তি পেয়ে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। সেখান থেকে বি. এস-সি (১৮৮৫) এবং ডি. এস-সি (১৮৮৭) ডিগ্রি লাভ করেন। এই সময় (১৮৮৭) তিনি 'হোপ পুরস্কার' পান। দুঃখের বিষয় তাঁর ডি. এস-সি থিসিসটি এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি রসায়ন বিভাগে কাজ শুরু করেন। তিনি তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন 'লেবরেটরিতে গবেষণা এবং ইংরাজী, ফরাসি, জার্মান ভাষায় লিখিত রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন - ইহাতেই আমার সময় কাটিতে লাগিল। ১৮৮৮ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

কর্মজীবন ও আবিষ্কার

বিদেশ থেকে ফিরে ১৮৮৯ সালের জুলাই মাসে তিনি সহকারী অধ্যাপক হিসাবে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। ১৮৯৫ সালে তাঁর

যুগান্তকারী আবিষ্কার 'মারকিউরাস নাইট্রাইট' সমগ্র বিশ্বে সাড়া ফেলে দেয় (এই বিষয়ে ১৮৯৬ Proceedings at Chemical Society-তে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়)। নাইট্রাইটস যৌগ নিয়ে তিনি ও তাঁর ছাত্ররা পরবর্তীকালে প্রচুর গবেষণা পত্র প্রকাশ করেছেন। ১৯১৮ সালে অধ্যাপক আর্মস্ট্রং প্রফুল্লচন্দ্রকে "Master of Nitrites' উপাধিতে ভূষিত করেন।

এরই মধ্যে চলতে থাকে দেশীয় ভেষজ নিয়ে গবেষণা। ১৮৯২ সালে ওষুধের কারখানা বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল এর পত্তন করেন এবং ১২ই এপ্রিল, ১৯০১ সালে এই কারখানাকে লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত করেন। ১৯০৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১৬ সালে অবসরগ্রহন করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে (Science College) রসায়ন বিভাগে 'পালিত অধ্যাপক' - রূপে যোগদান করেন। বাকি জীবনটা তিনি এই বিজ্ঞান কলেজেই কাটান। ১৯১৯ সালে রসায়নে শিক্ষকতা ও রসায়ন শিল্পের জন্য তিনি নাইট উপাধি লাভ করেন । ৭৫ বছর বয়সে 'পালিত অধ্যাপক' পদ থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'এমিরেটাস প্রফেসর পদে নিয়োগ করেন। এর মধ্যে বেঙ্গল কেমিক্যালের পরিচালনামন্ডলীদের সঙ্গে মতভেদের ফলে তিনি সভাপতির পদ ত্যাগ করে তাঁর সাধের কারখানা থেকে বেরিয়ে আসেন। ১৯৪৪ সালের ১৬ জুন তিনি শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস (History of Hindu Chemistry)

ফরাসি রসায়নবিদ মঁসিয় বার্থলো (1827–1907) ছিলেন সে যুগের এক বিখ্যাত রসায়নবিদ। তিনি পশ্চিম দুনিয়ার রসায়নের প্রগতি নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। বিশ্ব রসায়ন ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠ পন্ডিত হিসাবে তাঁকে মান্য করা হয়। সেই বার্থলো একদিন রসায়নের ছাত্র প্রফুল্লচন্দ্রের কাছ থেকে ভারতবর্ষের প্রাচীন রসায়নের ইতিহাস সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। জানতে চাইলেন প্রাচীন রসায়নে হিন্দুদের অবদান সম্বন্ধে। বার্থলোর একটি লেখা Journal Des Savants, Oct., 1897 প্রকাশিত হয়। সেখানে বার্থলো লিখছেন "….অতঃপর প্রফেসর রায়, প্রেসিডেন্সি কলেজ (কলকাতা), আমার দৃষ্টিগোচর করান যে বেশ কিছু নথিপত্র আমাদের পরীক্ষা করে দেখা কর্তব্য। এই পন্ডিতবরের মতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সংস্কৃতে লিখিত আলকেমি সংক্রান্ত গ্রন্থে কালো এবং লাল পারদের সালফাইড এবং ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত ক্যালোমেলের প্রস্তুত প্রণালীর নির্দেশাবলী রয়েছে।….”** বার্থলোর মূল ফরাসি লেখা প্রফুল্লচন্দ্র পাদটীকা হিসাবে উল্লেখ করেন তাঁর বইতে, এখানে তার একাংশ নিচে দেওয়া হল।

ছাত্র প্রফুল্লচন্দ্রকে বার্থলো সম্বোধন করলেন রসায়নের এক বিশিষ্ট পন্ডিত হিসাবে। প্রফুল্লচন্দ্র বার্থলোর দেওয়া এই সম্মানে শুধু খুশিই হন নি, এই সম্মানকে মাথা পেতে নিলেন এবং একটা লেখা (মূলত রসেন্দ্রসারসংগ্রহ থেকে) পাঠিয়েও দিলেন (April 1898) । বার্থলো সেই লেখা খুঁটিয়ে পড়ে দেখলেন; তাঁর মন্তব্য জানালেন এবং সঙ্গে তাঁর লেখা তিন খন্ডের আরব ও সিরিয়া দুনিয়ার মধ্যযুগের রসায়নের অবদানের ওপর বইও পাঠিয়ে দিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র নেমে পড়লেন একটি বিশাল কাজে।

মেঘনাদ সাহার "আচার্য স্মৃতি" থেকে পাই : "স্যার পি, সি. রায় আমাদের বলতেন যে, অধ্যাপক বার্থিলোর অনুরোধে তিনি 'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস' রচনা করেন। এই গ্রন্থ রচনা করতে তাঁকে প্রায় আট-নয় বছর টানা পরিশ্রম করতে হয়েছিল। একজন পন্ডিতকে (হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন) দিয়ে সংস্কৃত সংগ্রহের মানে করাতেন, তারপর প্রাচীন প্রস্তুত-প্রণালীর সঙ্গে আধুনিক প্রণালী মিলিয়ে দেখতেন। ন'বছর ধরে এই অক্লান্ত

পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে যায়। তাঁর বন্ধু এবং চিকিৎসক নীলরতন সরকার তখন তাঁকে বাঁধা-ধরা নিয়মে থাকতে উপদেশ দেন এবং আরও বলেন যে, তাঁহার একটু Relaxation দরকার।"

মেঘনাদ সাহা ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন অসম্ভব ছাত্রবৎসল। ছাত্রদের নিয়েই তাঁর সমগ্র জগৎ ও সংসার। ছাত্রদের মধ্যে মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে এই সব কৃতী ছাত্রদের হাতে তাঁকে মাঝে মাঝে নাকালও হতে হতো। মহাত্মা গান্ধীর চরকা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা নিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র খুব প্রশংসা করতেন এবং শেষ বয়সে, অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পর, তিনি গান্ধীবাদী হন। মেঘনাদ সাহা চিরকাল বিজ্ঞানের অগ্রগতির পূজারী। এই চরকা নিয়ে এলাহাবাদে মেঘনাদ সাহার সঙ্গে একবার লেগে গেল ঘোর তর্ক। শেষে বিরক্ত হয়ে প্রফুল্লচন্দ্র বললেন "তোমার সঙ্গে আর তর্ক করতে পারি না। তার চাইতে গাড়িটা বার করো, একবার নীলরতনের [ডঃ নীলরতন ধর] বাড়ি ঘুরে আসি।" মেঘনাদ সাহা ঠেস দিয়ে বলেলন, "এখন গাড়ি কেন? গরুর গাড়ি ডেকে দিই। "এই চরকা কাটা নিয়ে রবীদ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর মতানৈক্য হয়। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে কিছু উষ্ণ মত বিনিময়ও হয়। যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রফুল্লচন্দ্রের মধ্যে কখনও পারস্পরিক শ্রদ্ধার কোন অবনতি হয় নি।

মানবদরদী প্রফুল্লচন্দ্র রায়

শুধু রসায়নের গবেষক হিসাবে নয়, মানুষের কল্যাণে তিনি সারা জীবন নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি অনাথ শিশুদের জন্য ট্রাস্ট গঠন করেছেন। ১৯২১ সালে পরপর দু-বছর ফলন না হওয়ায় খুলনা জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য রিলিফ কমিটি স্থাপন করেন ও আর্থিক সাহায্য দান করেন। স্বগ্রামে রাড়ুলিতে শিক্ষা পরিষদ স্থাপন করেন। এই পরিষদ থেকে ছাত্র ও বিধবারা যাতে সাহায্য পান সেজন্য তিনি ১০,০০০ টাকা দান করেন। সমস্ত সঞ্চিত অর্থ বিজ্ঞান কলেজের উন্নতির জন্য দান করে দেন। বিজ্ঞান কলেজে ১০,০০০ টাকা দিয়ে নাগার্জুন পুরস্কার প্রদান করেন। উত্তরবঙ্গের বন্যা দেখা দিলে প্রফুল্লচন্দ্রের তত্ত্বাবধনে রিলিফ কমিটি স্থাপন করা হয়। এই কমিটিতে যোগ দেন সুভাষচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত এবং আরও অনেকে। কয়েক লক্ষ টাকা, ওষুধ ও খাদ্য সংগ্রহ করে বন্যাপীড়িতদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এইরকম বহু সমাজ সেবামূলক কাজে প্রফুল্লচন্দ্রকে আমরা দেখতে পাই।

বাংলার ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার কথা তিনি বারবার বলেছেন। বাংলা ভাষায় তাঁর লেখা বইগুলোর মধ্যে 'খাদ্য-বিজ্ঞান' ও 'সরল প্রাণিবিজ্ঞান' আজও বিস্ময় জাগায়। তাঁর লেখা বাংলা বইয়ের সংখ্যা বাইশ। এর মধ্যে উল্লেথ করা যেতে পারে 'বাঙালির মস্তিক ও তাহার অপব্যবহার', 'জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায়', 'অন্নসমস্যা' ইত্যাদি।

তিনি সারাজীবন ধরে আমাদেরকে বলতে চেয়েছেন যে কুসংস্কার ত্যাগ করে যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে খোলামনে জীবনের পথ চলো। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন প্রতিবাদ করেছেন। স্কুল কলেজের ডিগ্রী লাভ করে ভালো চাকরি লাভ করা যেন বাঙালির একমাত্র উদ্দেশ্য - ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি বাঙালির অনীহাকে তিনি বারবার তুলে ধরেছেন।

তাঁর সম্বন্ধে শুধু একটা আফসোস থেকে যায় যে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে (যে বছর তিনি নাইট উপাধি পান) রাউলাট আইনের প্রতিবাদে জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র মানুষের জমায়েতের ওপর যখন গুলি চললো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইট উপাধি ত্যাগ করলেন, কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর সদ্যপ্রাপ্ত নাইট উপাধি কেন ত্যাগ করলেন না?

মানবদরদী, অকৃতদার এই শিক্ষক ও গবেষকের সারা জীবন ছিল তাঁর ছাত্রদের ঘিরে। যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ তৈরী এবং বিজ্ঞানের প্রয়োগে মানুষের উপকার সাধনই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত।

সংকলক: দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগ্রহ:

১. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (জীবন। কর্ম। রচনাসংগ্রহ) - ডঃ সন্তোষকুমার ঘোড়ই

২. বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র - শ্যামল চক্রবর্তী

৩. মননের মূর্তি (প্রফুল্লচন্দ্র রায় : মুক্তচিন্তার অজানা পদাতিক) - ডঃ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

৪. বাঙালির মস্তিস্ক ও তাহার অপব্যবহার - আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

৫. জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় - আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

৬. History of Hindu Chemistry (Vol - I) – Prafulla Chandra Ray

৭. Life and Experiences of a Bengali Chemist – Prafulla Chandra Ray

*The Vádanta philosophy, as modified and expanded by Sa*m*kara, which teaches the unreality of the material world, is also to a large extent responsible for bringing the study of physical science into disrepute. (*Page 195, History of Hindu Chemistry by P.C.Ray*)

Cependant il serait nécessaire d'examiner certains documents qui m'ont été récemment signalés par une lettre de **Ray, professeur à Presidency College (Calcutta). D'après ce **savant**, il existe des traités d'alchimie, écrits en Sanscrit, remontant an XIIIE siècle, et qui renferment des préceptes pour préparer les sulfures de mercure noir et rouge et le calomel employés comme médicaments. (*Page 3, History of Hindu Chemistry by P.C. Ray)*

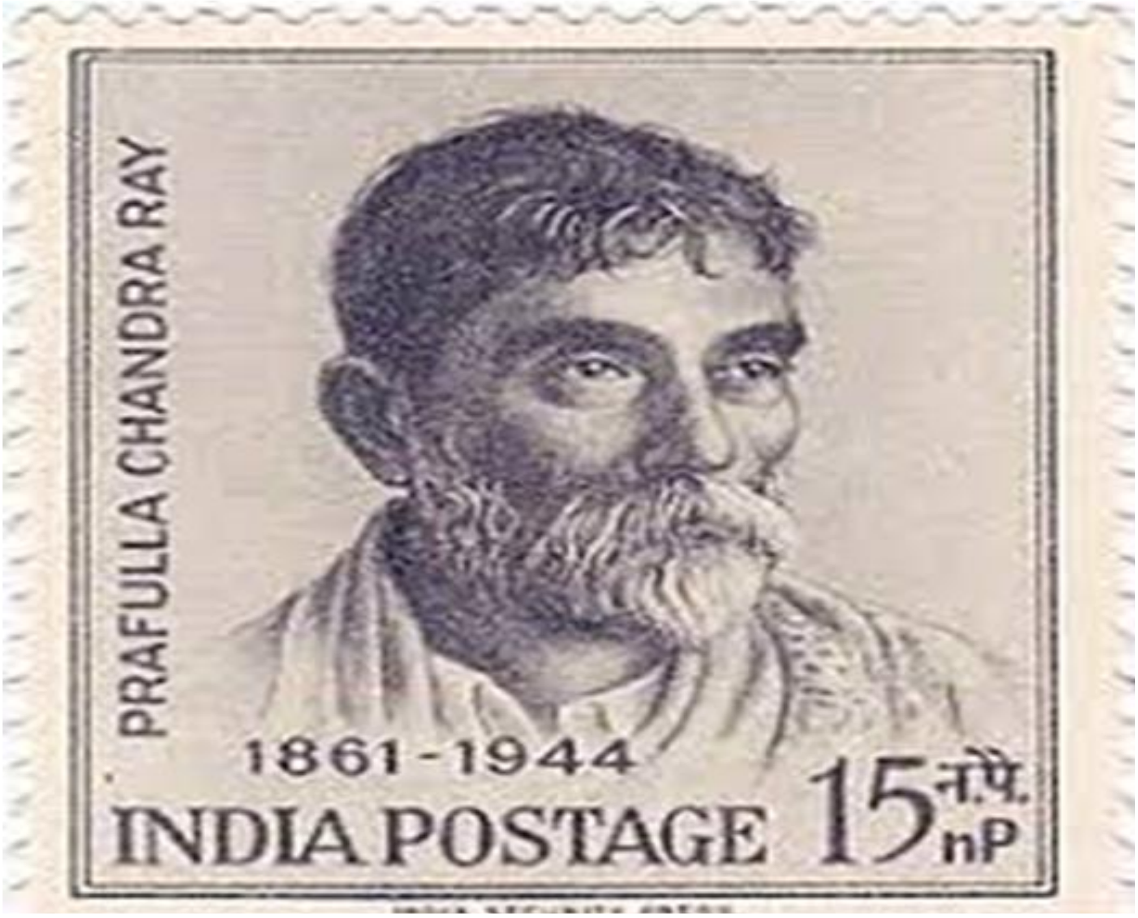

"They" as a Singular Pronoun"

Dhruba K. Chattoraj

I am seldom attracted to read beyond the newspaper headlines these days. However, a recent article in the op-ed section of The Washington Post with the title, – ""They' has been a singular pronoun for centuries. Don't let anyone tell you it's wrong," (https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/10/21/they-has-been-singular-pronoun-forever-dont-let-anyone-tell-you-its-wrong/) caught my attention because of its academic nature, a refreshing departure from politics, violence, race, and social media issues that dominate the news world.

We all know that some pronouns, such as 'you', can be both singular and plural, depending on the context in which it is used. But if someone claims that 'they' can be used as a singular pronoun, I will bet a fortune that they are wrong. The author, Dr. Anne Curzan, professor of English and linguistics at the University of Michigan, gave a few examples that exposed my ignorance. The sentences sounded so proper that I thought you might be intrigued to also know that 'they' can indeed be singular! The examples are: "But to expose the former faults of <u>any</u> person, without knowing what <u>their</u> present feelings were, seemed unjustifiable"; "Alex is spending <u>their</u> senior year in Alaska"; "<u>A</u> serious runner replaces <u>their</u> shoes every few months"; and "My <u>neighbor</u> washes <u>their</u> car every day." Note, as Prof. Curzan pointed out, that "they" is used as a singular pronoun when the gender of the person is unknown or irrelevant.

In our professional life, we come across single author publications where the sole author refers to himself/herself as we/our and not I/my (e.g., we discovered/our hypothesis rather than I discovered/my hypothesis). Both uses are apparently acceptable since both are found in prestigious journals, but one sounds arrogant, and a touch of humility sometimes makes the argument more convincing. Though, I could be biased for not growing up in an "I"-based culture. Another more frequently encountered case is when we respond to comments from reviewers, who are almost always anonymous. These days the comments can be longer than the paper itself and sometimes it is quite tiring to refer to the reviewers throughout as she/he or s/he. A gender-neutral singular pronoun such as 'they' would be desirable.

Prof. Curzan did not say what prompted the discussion of the singular form of 'they' now, although she notes that 'they' has been used as singular pronoun since the time of Shakespeare. Lately, I have come to appreciate that the singular 'they' has a new use of great social significance. I have noticed that some people identify their gender-appropriate pronouns in their email signature. I was particularly intrigued when I saw that our NCI

Director included his pronouns at the bottom of his email (screenshot below).

Ned Sharpless, M.D. (he/him)
Director

I could not figure out why he must assure us that he carries a Y chromosome. A colleague who also identifies her gender as she/her in her email explained to me what the new element of email signatures is meant to convey.

According to her, sharing your pronouns is not required but it is a way to indicate that you are more inclusive of others, including members of the LGBTQ+ community, that do not identify with the gender they were assigned at birth. The link below further expands on the use of pronouns in the workplace.

https://www.thehrcfoundation.org/professional-resources/talking-about-pronouns-in-the-workplace

So, if someone uses "they/them/theirs" pronouns it simply means they do not identify within the binary "norms" of male or female gender. A non-binary person typically prefers gender-neutral pronouns such as the 'they/them' (e.g., "I know Sam. They work in the Accounting Department").

The timeliness and purpose of the "They" article could be to indirectly emphasize the importance of respecting gender identity. Whichever way an individual identifies himself/herself/themself, it is respectful to use their chosen pronouns. Many people who identify as nonbinary use 'they' and now the singular, nonbinary 'they', is here to stay.

In writing this short article I realized that pronouns matter more than I originally thought. It identifies an aspect of a person that their proper name does not. It also appears that a new social norm is developing where adding a few letters to your email signature can be an effective platform for sending a powerful message of support. For example, these days the NIH Director's emails end with:

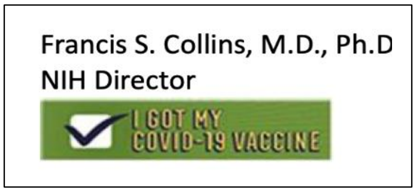

This is Dr Collin's way of saying he supports vaccination and is also a way of leading by example.

Shall I use 'they' in singular form? Yes. From now on I will use 'they' when referring to people who identify as such. What do you have to lose by being inclusive and respectful of others?

হোয়াটস্‌এ্যাপ

গৌরীশঙ্কর মুখার্জ্জী

ঘুম থেকে উঠেও ঘুমের কাটেনা রেশ,
মাথায় রয়েছে ঘুমের আবেশ!
তবু এভাবেই উঠে,
মুখ ধুতে ধুতে,
ঢুলু ঢুলু চোখে,
মন চলে যায় হোয়াটসএ্যাপে।

মিডিয়া সোসাল,
আমাকে করেছে মাতাল।
ঘুম হয়নি গতকাল,
এখনও চোখে ঘুম একতাল,
হোয়াটস্‌এ্যাপ এখন এক হবি,
খুঁজে পাই নানান কথা ও ছবি!

একতাল ঘুম চোখে
হোয়াটস্‌এ্যাপে আঙুল ঘষে
দেখি সব মুচকি হেসে,
গিলে খাই সহস্রাধিক সুপ্রভাত,
যেন দুপুরের গরম ভাত।
মেসেজে আসে শুভেচ্ছাসহ ভালো থাকার উপদেশ,
তার সাথে ছোট বড় নানান আদেশ ।

এভাবেই কেটে যায় মিনিট থেকে ঘন্টা,
ধীরে ধীরে জমে যায় তরল মনটা,
অজান্তেই ভারী হয়ে যায় মাথাটা।

হারায় মনের চিন্তা শক্তি,
সঙ্কুচিত হয় মনের ব্যাপ্তি,
করিনা কিছু নতুন সৃষ্টি,
তবুও সরেনা হোয়াটস্‌এ্যাপ থেকে দৃষ্টি।

শব্দ

যশোমান ব্যানার্জী

রোজকার মতই
হারিয়ে যাওয়ার এলোমেলো ডাক
শহরের যানজটে বিলুপ্ত
কোন শিশু কিশোর বা কিশোরী
কোন যুবক বা যুবতীর
কোন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার
হারিয়ে যাওয়ার ডাক
হেড ফোনের গা পর্যন্ত পৌঁছেই
নিস্তব্ধ অবহেলায় ছড়িয়ে পড়ে রাস্তায়
শব্দও দরকারি, অদরকারি হয়
আর কিছু শব্দ
শুনেও শুনতে পায়না মানুষ
যেমন ভালবাসার শব্দ।

Our discourse*

Jayasree Basu

Not sure if you ever wore that sari
Colorful as it was, unlike your recent attire
I paused a little, asking, 'will you ever wear it?'
You grinned widely, 'Of course, it's from you!'

Not sure if you ever wore that sari
That your days were so numbered
you couldn't even guess!

But you came to me in my dream
Wearing that sari, your dense hair
With dark and gray shades, parted
And tied together like a schoolgirl,
Holding my hand, you urged
'Let us go near the river'!

So we went beside the river
The same river where we floated
So many little boats of our youthful chatters!
But alas, the river is different now
Shrunken by aged soils piled on the banks.
We spoke our words softly
No one heard us,
We spoke our words loudly

No one heard us,

The river paid no attention

The pedestrians ignored us,

The wind blew our words away

To the fading glows of the setting sun!

I smiled at you

You smiled at me

Everything has changed

Except our discourse

Except us!!

*In loving memory of a childhood friend lost to COVID.

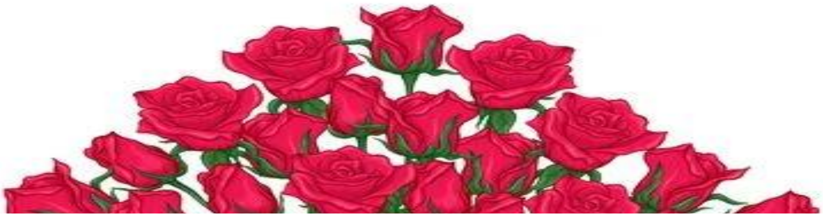

দুই পোর্টল্যান্ডের কাহিনী (A tale of two Portlands)

মৌসুমী মোহারার

২০১৪ সালের জুলাই মাসে এক কনফারেন্স – এ পোর্টল্যান্ড Oregon যাবার সুযোগ হয়েছিল আর ২০২১ এর অগাস্ট মাসে গেছিলাম পোর্টল্যান্ড Maine। দুই পোর্টল্যান্ড শুধু অবস্থানের বিচারে (USAর পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তে) সম্পূর্ণ বিপরীতই নয়, দুটির সংস্কৃতির বৈপরীত্যও প্রবল লক্ষণীয়। প্রথমে পশ্চিমের পোর্টল্যান্ড এবং পরে পূর্ব পোর্টল্যান্ড এর অভিজ্ঞতা বলছি।

পশ্চিমের পোর্টল্যান্ডের সংস্কৃতিতে এশিয়ার প্রভাব বেশ প্রকট। শহরের মধ্যবর্তী বাগানগুলো তার সাক্ষ্য বহন করছে। সৌভাগ্য হয়েছিল Lan Su Chinese Garden, পোর্টল্যান্ড জাপানীস গার্ডেন এবং International Rose Test Garden উপভোগ করার। আর বিভিন্ন fusion cuisineএর স্বাদ ভুলবার নয়। এই পোর্টল্যান্ডের পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর আর পুবে Cascade mountain। কনফারেন্সের শেষে একটি tour নিয়েছিলাম। Sea to Summit কোম্পানির Columbia Gorge and Mt Hood Tours। সারাদিনের ট্যুর। হোটেল থেকে তুলে নিয়ে যাবে সকাল আটটায় আর হোটেল'এ ফিরিয়ে দেবে সন্ধ্যা বেলায়। প্রথম শুরু হলো বিস্তীর্ণ কলম্বিয়া river gorgeএর নান্দনিক দৃশ্য দিয়ে। এরপর অনেক ছোট ছোট জলপ্রপাত পেরিয়ে এলাম Multnomah Falls (one of North America's tallest year round waterfalls। ছবিতে দেখা যাবে এই জলপ্রপাতের বিশিষ্টতা। এরপর গেলাম Bonneville Dam salmon ladders and Oregon's largest fish hatchery। এরকম অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি। মৎস্য প্রিয় বাঙালীর মাছ চাষের দৃশ্য তো ভালো লাগবেই। মাছ চাষ দেখার পর গাড়ি চললো পীচ ক্ষেতের মধ্য দিয়ে। দ্বিপ্রাহরিক ভোজন এর জন্য থামলাম এক ছোট খাবারের জায়গায় যেখানে স্থানীয় ফল দিয়ে বানানো খাবার পাওয়া যায়। পরবর্তী গন্তব্য Mt. Hood ও Timberline Lodge। শেষ জুলাই এর গরমেও Mount Hood এর চূড়ায় বরফ. Timberline lodge বেশ খানিকটা উঁচুতে, প্রায় চূড়ার কাছাকাছি মনে হয়। যদিও জানি দেখতে অমন মনে হলেও, আসল চুড়ো অনেকটাই দূর। ওই অত উঁচুতেও কাঠের তৈরি এ বাড়ী খুব সুন্দর। ভেতরে আধুনিক জীবন ধারার সব সুবিধাই বর্তমান। শুনলাম ওখানে থাকতে হলে এক বছরের ও বেশী সময়ের আগে বুক করতে হয়। একটা দিন প্রকৃতির মধ্যে কাটিয়ে ফিরে এলাম জমজমাট পোর্টল্যান্ড Oregonএ। এই পোর্টল্যান্ড IT hub হয়ে উঠছে, তাই সাদা কালো হলুদ খয়েরী সব মানুষেরই দেখা মেলে। বিশেষতঃ শহরের মধ্যে কখনো মনে হয়নি, "হেথায় তোমায় মানাইছে না গো" !

এবার আসি পূর্ব প্রান্তের পোর্টল্যান্ড এর কথায়। পোর্টল্যান্ড মেইন। যেদিন পৌঁছলাম ঝিরঝিরে বৃষ্টি। অগাস্ট মাসেও একটু শীত শীত ভাব। মূলতঃ শ্বেতাঙ্গ মানুষের আধিক্য এই অঞ্চলে।এটি একটি বন্দর শহর।Atlantic এর ধরে এই শহরে সময় যেন থমকে রয়েছে। শহরের পাশে সমুদ্রের মধ্যে ৩০০টি ছোট ছোট দ্বীপ। বেশ কয়েকটিতে জনবসতি রয়েছে। কিছু দ্বীপে শীতকালে মানুষ থাকতে পারেনা, কারণ জল সরবরাহ বন্ধ করতে হয়, ঠান্ডার জন্য। এই পোর্টল্যান্ড লবস্টার এর জন্য বিখ্যাত। এই দ্বীপগুলোতে ferryর মাধ্যমে

নিয়মিত যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। আমরা নিয়েছিলাম Casco Bay Linesএর DIAMOND PASS RUN cruise। এই ছোট scenic মরশুমী cruiseটা চারটে দ্বীপ এ থামে। স্থানীয় লোকেরা ওই দ্বীপে থেকে যায় আবার পরদিন ফিরতি cruise এ মূল ভূখণ্ডে ফিরে আসে। দ্বীপের কটেজ ও সামুদ্রিক তটভূমি মনকে উদাস করে। ওই নির্জন দ্বীপে দুদন্ড জিরিয়ে নিতে মন চায়। যেতে যেতে সমুদ্রে দেখলাম seal, পানকৌড়ি, Osprey (মাছ খেকো পাখি)। আর দেখলাম লবস্টার trap। কিছু তফাতে রঙীন ফাঁদ। অসংখ্য। মূল পোর্টল্যান্ড'এ জ্যান্ত লবস্টার কেনার সুযোগ আমরা হাতছাড়া করি নি। বেশ কিছু জ্যান্ত লবস্টার নিয়ে রওনা দিলাম বাড়ির পথে।

পূর্ব ও পশ্চিম পোর্টল্যান্ডের একটা মিল হলো ঝিরঝিরে বৃষ্টি। পোর্টল্যান্ড Oregon'এ প্রতিদিন একটুক্ষণের জন্য হলেও বৃষ্টি হয়েছে, এবং রোদ ও উঠেছে বৃষ্টির পর। কিন্তু পোর্টল্যান্ড Maine কেমন একটা স্যাঁতস্যাঁতে ভাব ছিল। হয়তো আমাদের ভাগ্য, সূর্যালোকিত পূর্ব পোর্টল্যান্ড উপভোগ করা

হলো না। প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে দুই পোর্টল্যান্ড সম্পূর্ণ বিপরীত মেরু তে বিদ্যমান। যদিও দুটো একনাম্নী শহর দুই ভিন্ন মহাসাগরের তীরে বসে দুই ভিন্ন উপাখ্যান রচনা করে চলেছে। পূর্ব রেখেছে সময়কে বেঁধে আর পশ্চিম চলেছে আগামীর দিকে অতি দ্রুততায়।

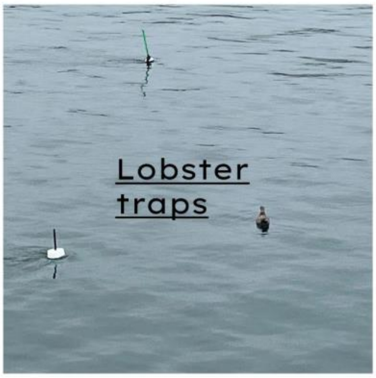

Soft Jelly Plug of Platelet-fibrin Thrombus in the Injured Artery Kills the Heart and Brain resulting in Death and Paralysis: Preventive Measures with Exercise, Diets and Drugs

Mrinal Kanti Dewanjee

Abstract

Using Indium-111 tagged platelets and Iodine-125 tagged fibrinogen, we developed the methods of measurement of the slippery and deadly platelet-fibrin thrombus in the animal models and patients, that result in the choking death of heart and brain. We also observed that the intervention itself for reopening the blocked artery, e.g., angioplasty and coronary artery bypass surgery (CABG) also injures the internal lining of endothelial cells and the rupture of wall, causing the early closure. We used the dual antiplatelet drug therapy, e.g., aspirin and Plavix for angioplasty and aspirin-dipyridamole for CABG for maintaining blood flow. The adherent platelet thrombus radioactivity was used as an index of thrombogenicity and was converted into number of platelets per unit area, identified as the regional platelet density (RPD). The RPD values played a critical role in screening a dozen of antiplatelet drugs in the canine and porcine models and finally into patients after FDA approval. In addition, the surfaces of artificial blood vessels, artificial heart valves and heart-lung machine used a variety of biopolymers, e.g., the Dacron polyester and Teflon and metals, e.g., stainless steel, nickel-titanium alloy used in stent; they are also highly thrombogenic and patients must be treated with antiplatelet drugs. Considering the small diameter of the coronary artery (2-3 mm) and cerebral artery (3-4 mm), even smaller in the Asian men and women, we must strive against the seven decades of cholesterol deposition with the statins and daily exercise. However, platelet thrombus formed on the cholesterol-loaded ruptured artery could block it in 30 minutes. Our blood-circulatory network of ~100,000 miles of highways, arteries, veins, and capillary network is susceptible to continuous damage by smoking, pollution and viral attack-COVID-19; we must protect them if we want to live beyond 80-90 years.

Introduction

This article dealing with heart attack and stroke arising from years of vascular diseases, is a fitting tribute to the birth centenary of Satyajit Ray, the best Indian filmmaker whose evocative stories of Bengali life drew little attention and had a small audience in India but enjoyed universal appeal due to their depiction of human emotions and relations. Ray finally won the honorary Oscar for lifetime achievement and died on April 23, 1992 in a hospital in Kolkata. He suffered the first heart attack in 1983 from a challenging life of hard work, lifetime smoking and limited resource, which adversely affected his coronary arteries and lungs till his death.

After almost seventy years of research on heart attack and stroke, we now have access to novel methods of rapid diagnosis of narrowed arteries, interventions for opening blocked arteries by angioplasty or coronary artery bypass surgery, removing the blocking thrombus by the clot-buster enzyme, tissue plasminogen activator (tPA, Genentech, Inc.) or pulling out the thrombus by a catheter, called thrombectomy. These counter-measures have revolutionized the practice of cardiovascular medicine and are saving thousands of lives every day. But we have a short window of three hours for minimizing the damage to brain and five hours to ischemic heart, since the heart has a reserve supply of oxygen, glucose and fatty acids; the brain a supply of only oxygen and glucose. I have been making visual cartoons for explaining the countermeasures for these deadly diseases. It is critical to differentiate heart attack from sudden cardiac arrest or death (SCA, SCD), when heart suddenly stops, which results from arrythmia and is more deadly for patients. Half of SCA patients suffered symptoms days or even weeks earlier e.g. palpitations, loss of blood pressure and consciousness, chest pain and breathing difficulty. For SCA patients, we must call 911, do cardiopulmonary resuscitation (CPR) and use automatic external defibrillator (AED). About 350,000 per year (?) suffer from SCA outside the hospital and only ~10% survive after SCA.

The platelet-fibrin aggregates inducing the arterial thrombus and red cell fibrin-rich vein clots (Figures 1 and 2), cause the deep thrombosis and pulmonary embolism, originally characterized by pioneer pathologist, Rudolf Virchow at the Berlin Cherita Hospital in 1860s (Netflix series). The components of platelets, red cells and fibrinogen molecules are already present in blood. Thrombus formation is essential if there is a gunshot wound into the blood vessels to prevent the rapid blood loss and the eventual death from the hypovolemic shock.

Before rapid intervention, we must make sure that there is a culprit of platelet thrombus by CT-angiography or MRI. If there is a hemorrhage, we

will make it worse by these drastic interventions with tPA, the clot-buster, where the blood will enter the brain tissue. These interventions also damage the coronary or cerebral artery by loss of the protective endothelial cells, ruptured wall of artery or damage the saphenous vein by mechanical manipulations. We could prevent the shunt-closure from 30% to 3% with dual antiplatelet drugs, Aspirin and Dipyridamole. Since the arterial injury in angioplasty is so severe, we also needed dual antiplatelet drugs, Aspirin and Plavix or Brilinta for reducing the thrombus level for 6-12 months and promote endothelial cell and wall repair.

Figure 1. Cartoons of the Platelet (Left), Red vein clod (Right), White platelet thrombi (SEM, Middle) and killers in brain and heart attack, and deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE) show the composition of platelet-fibrin aggregate gel and red cell-fibrin aggregated gel respectively. Courtesy of MK Dewanjee. May 17, 2021. Chapter 15, p486, iUniverse, Bloomington, IN, USA. https://www.iuniverse.com/en/bookstore/bookdetails/817594-measuring-and-imaging-the-arterial-platelet-thrombus-in-heart-attack-and-stroke

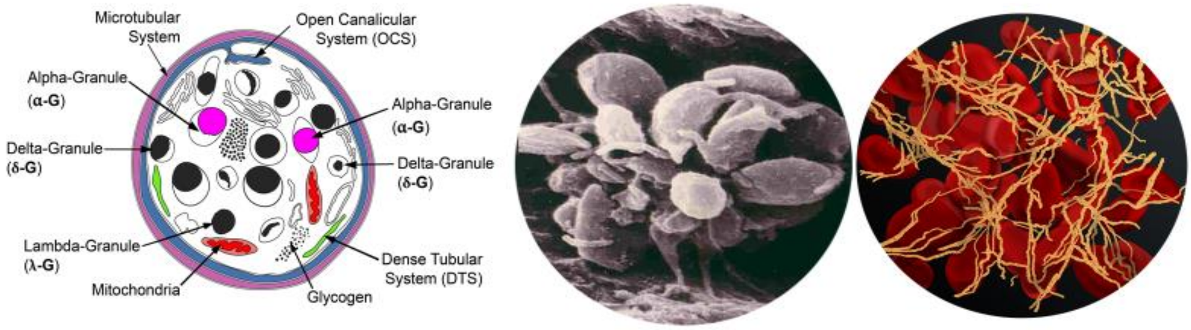

Figure 2. Cellular elements of blood and fibrinogen molecule in plasma, a clotting factor, make the two-edge swords of Platelet-Fibrin mesh in Clotting and Bleeding in their deficiency.

Red Cells (Most Abundant, ~5 Million/µL), Platelets (~250,000/µL) and Multiple Types of White Cells (~1,000-10,000/µL) in Human Blood

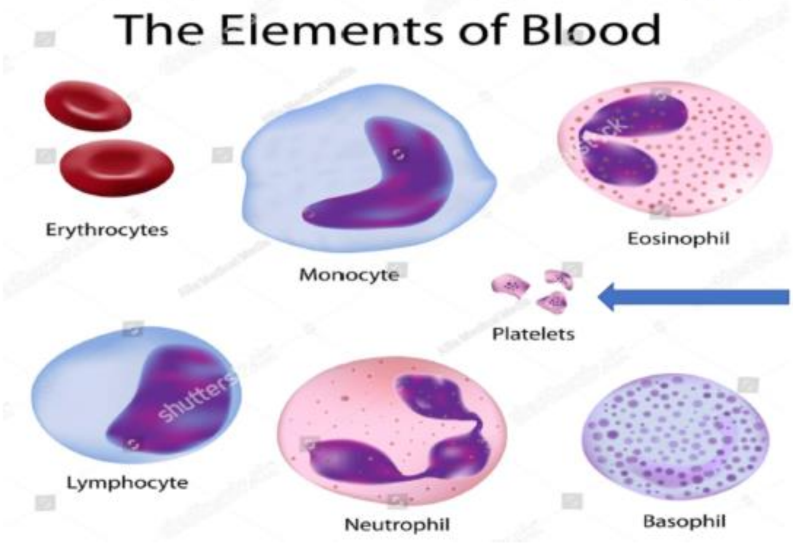

Platelets: Tiny Fragments of a Megakaryocyte: Double-edge Sword: Good in Plugging a Bleeding hole and Bad in Surface Injury of Artery: Choking Blood Supply by Thrombosis.

damage the coronary or cerebral artery by loss of the protective endothelial cells, ruptured wall of artery or damage the saphenous vein by mechanical manipulations. We could prevent the shunt-closure from 30% to 3% with dual antiplatelet drugs, Aspirin and Dipyridamole. Since the arterial injury in angioplasty is so severe, we also needed dual antiplatelet drugs, Aspirin and Plavix or Brilinta for reducing the thrombus level for 6-12 months and promote endothelial cell and wall repair.

The major theme of chronological events as we age, leading to the brain or heart attack (BAHA) is as follows:

Vascular aging→ High blood pressure/Hyperlipidemia → Atherosclerosis → Cholesterol plaque rupture → Thrombotic occlusion → Stroke-MI (BAHA) →Paralysis/Death →Intervention → Regeneration of blood flow→10-30 years of a Second life with drugs, diets, and exercise. Hundred is a good number to remember for our physiological parameters: Systolic blood pressure 100 mm of Hg, blood sugar level: 100 mg/dL and LDL-Cholesterol100 mg/dL.

Annual deaths from heart attack amount to 900,000 per year. Someone in the United States has a heart attack every **40 seconds.** Every **4 minutes,** someone dies of stroke. Stroke deaths were ~150,000/year in 2019. About **87%** of all strokes are <u>ischemic strokes</u>, in which blood flow to the arteries of brain is blocked. With a delay of every 30 minutes, the chance of survival without damage decreases by 15%. After an ischemic or thrombotic stroke, neurons die at a rate of 2-30 million and 15 billion synapses per minute in the acute phase. With mobile CT-scanner unit, initiated in 2014, millions of neurons and thousands of lives could be saved. Within a golden period, tPA could breakdown the thrombus by cutting the fibrin strand and reinitiate blood flow. The smaller emboli will localize downstream. tPA was first approved by FDA in 1996. However, only ~45% of victims get the benefit of tPA therapy due to late administration with 6% deaths and 2% stroke. With a mobile CT scanner, tPA could be delivered in the ambulance saving the dying organs.

Vascular endothelial cells (~one trillion, human) lining the 60,000 to 100,000 miles of highways of blood circulation is the gatekeeper for controlling all organ functions and tissues in health and many types of diseases including atherosclerosis, dementia, diabetic retinopathy and cancer. Healthy blood vessels, aerobic cell metabolism and nutrient intake with lower calorie are the major determinants of longer life span. We could slow down the buildup of cholesterol on the wall of artery for 60-70 years by limiting daily cholesterol intake to 300 mg (~one egg yolk), red meats and use of many varieties of the statins for lowering the blood

cholesterol level to 100 mg/dL. We could reduce the platelet thrombus by taking 81 mg of baby Aspirin if we could tolerate it without getting ulcer. At seventy, our arteries are stiffer and loaded with cholesterol accounting for 50-70% blockage; if it exceeds 75-80%, we feel chest pain when climbing stairs or exertion. When the unstable cholesterol-plaque with dysfunctional endothelial cells ruptures, the platelet thrombus forms suddenly inducing heart attack. Rapid interventions in five hours are essential for saving the heart muscle, which has a reservoir of fatty acids and glucose. The Pharma and FDA play a critical role in the manufacturing, conducting clinical trials and regulating the approval of these critical drugs. The journey of a specific drug from bench to bedside takes a decade and several billion dollars for testing the safety and efficacy in the three phases of costly clinical trials. I discussed the three latest categories of drugs: the anti-platelets, anticoagulants for thrombus and the statins for lowering the burden of cholesterol. Except the heparin polysaccharide, which is delivered sub-cutaneously (low-molecular weight fragment) or intravenously (full-length heparin), all other drugs could be taken orally (19).

The platelet-fibrin rich thrombus-Seed of death

For almost two hundred years, the cardiologists, pathologists, hematologists and surgeons are at their wits' end to find a measurable parameter/biomarker for the index of platelet thrombus formation and embolization (1-5). When I was given the opportunity of measuring the platelet-fibrin thrombus at Mayo Clinic, I immediately focused on the dual-partners of platelets and fibrinogen molecules of circulating blood in the choking death of heart and brain. I started spying on their assembly on injured arterial wall or thrombogenic surface of all cardiovascular prostheses in the animal models with two gamma-emitting radionuclides of Indium-111 and Iodine-125, which are easy to measure with a gamma counter and a gamma camera (Figures 3 and 4). Finally, we carried out the clinical trials successfully in patients at Mayo Clinic with FDA approval. My training in nuclear science provided me a domain of my interest in making the radioactive molecular probes and accurate measurements with algebraic equations for the absolute and complete mapping of the grafts of artery, vein or heart valve leaflets. After three years of research in large animals, I found a novel method for measuring the number of platelets at the injured site, which I defined as a regional platelet density, a normalized value applicable to all types of injured arteries, prostheses, and animal models including human patients. In large animals, we did in vivo imaging and performed further analysis of adherent thrombus at autopsy. However, in patients, we could only image radioactive platelet thrombus with a

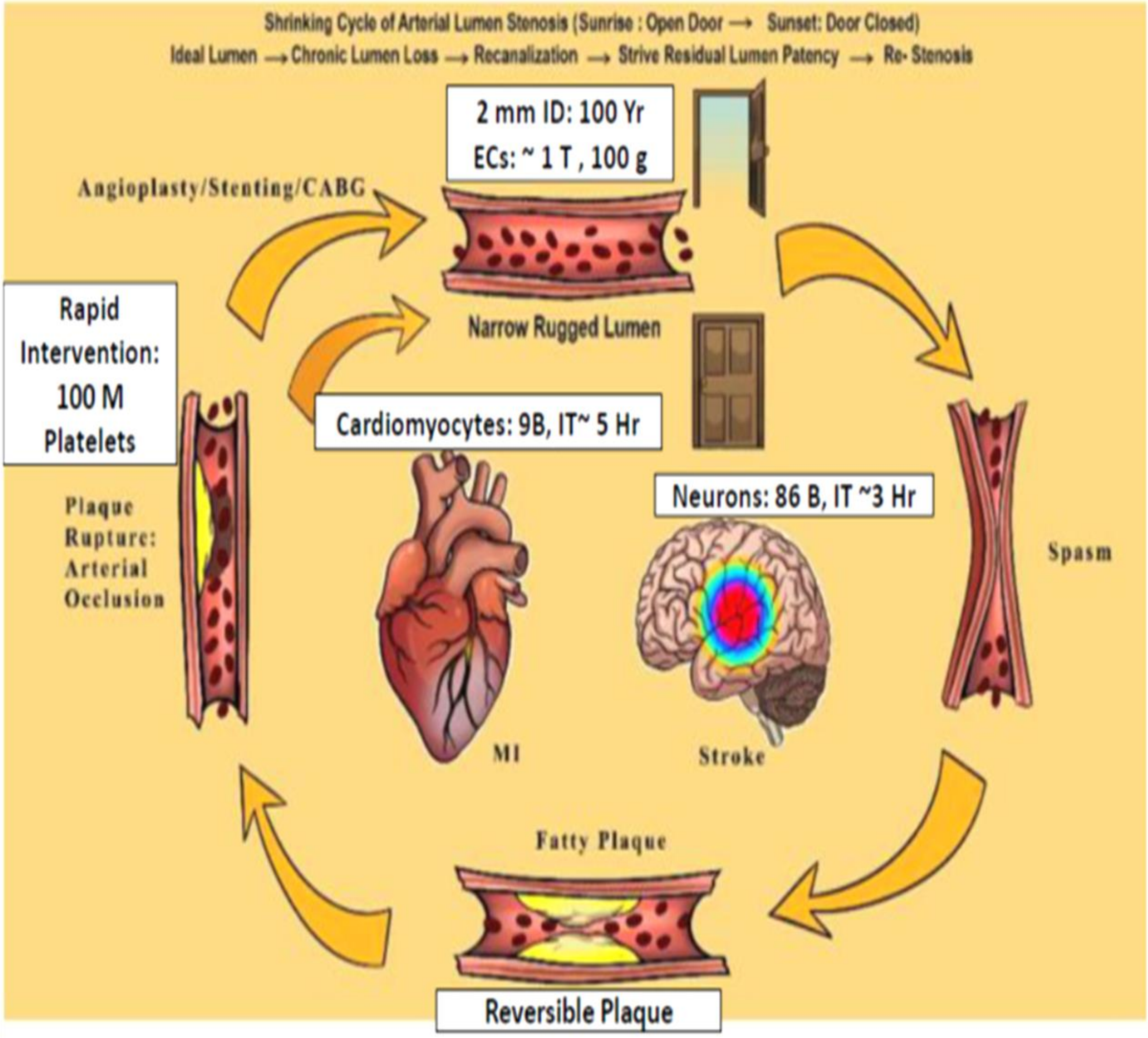

Figure 3. Saving Life by Rapid Interventions with Angioplasty and CABG followed by Dual Antiplatelet Drug Therapy. Dewanjee MK. Preface, p8, Measuring and Imaging Thrombi, iUniverse Publisher, May 14, 2021.

gamma camera. Since the platelets live about 40, 50 and 120 hours in blood for dogs, pigs and patients, we subtracted the radioactivity in blood with Technetium-99m labelled radioactive red cells. Figure 3 shows the cells of blood: red cells, white cells and the non-nucleated platelets. We spied on these platelets and fibrinogen with the gamma-emitting radionuclides of Indium-111 and Iodine-125 fibrinogen molecule, respectively (5-19). These difficult measurements for imaging the migrating thrombus, helped us in understanding the mechanisms of thrombosis by changing shear which causes platelet fragmentation and effect of species effect, e.g., canine platelets are more thrombogenic than human, primate or porcine platelets.

Figure 4. EKG for ST-segment elevation for finding Heart muscle damage-MI (myocardial infarct) and Enzyme assay, the diameter of coronary arteries, Plaque status and Calcification. Sequence: ECG → Non-invasive Nuclear Imaging → 3D-CT-Angiography (Rapid diagnosis-Intervention for Reinitiating the Blood Flow in less than 5 hours to save the dying heart muscle)

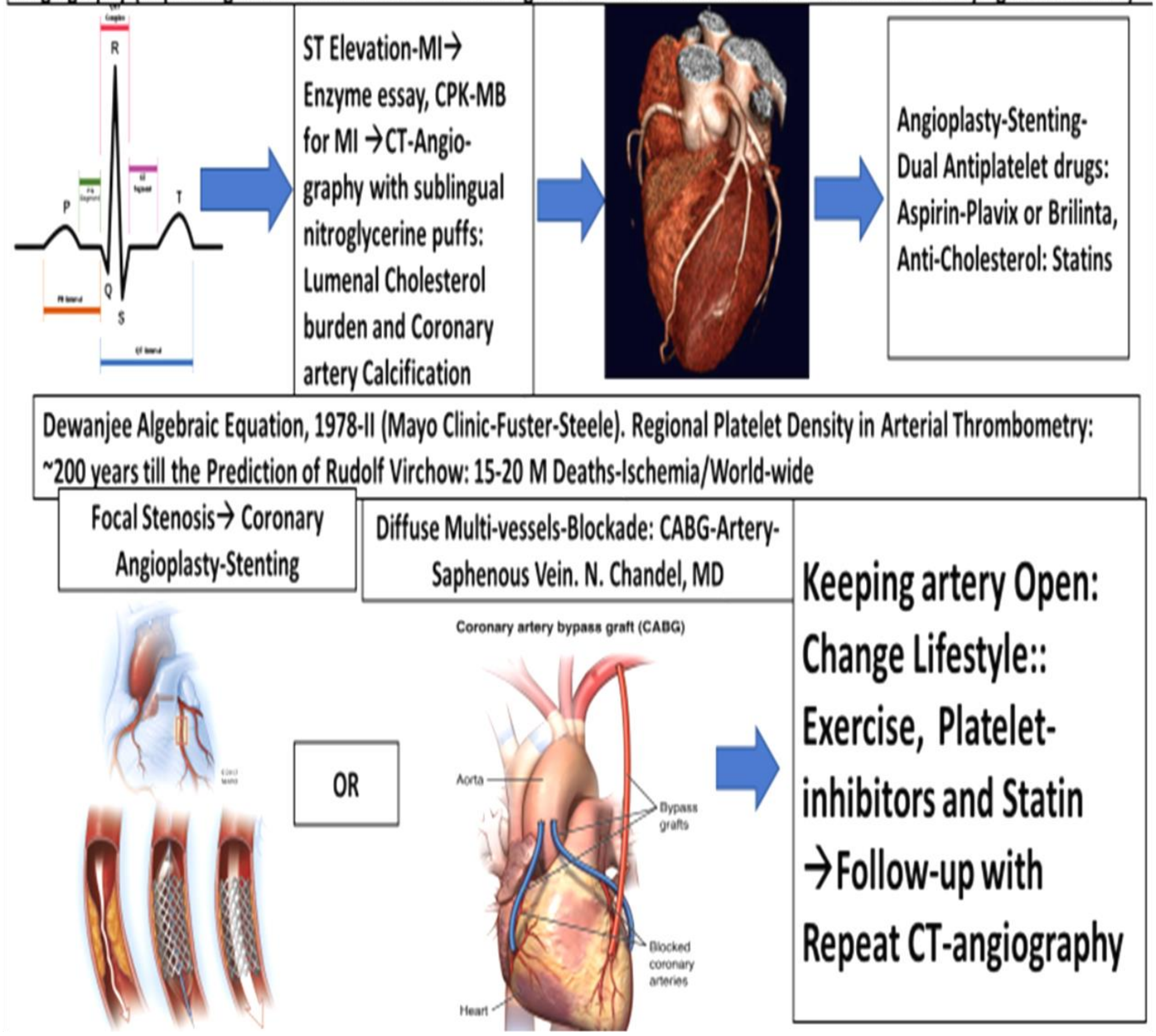

We used the plastic model of constriction, aneurysm and selection of less thrombogenic biomaterials (metals, alloys, fabric-polymers) in designing the artificial blood vessels, tissue heart valves and oxygenators used in the heart-lung machine (10-19). My calculation estimated that about 75 to 150 million platelets could completely block blood flow in a ruptured coronary artery with a diameter of 2-3 mm (Figure 3). For the focal blockade of coronary artery as evaluated by the CT-angiography, could be opened by a ballooned catheter at 8-10 pounds of pressure. For a longer section of coronary blockade, the coronary artery bypass surgery (CABG) is recommended by opening the chest. The saphenous veins from the groin area and mammary artery in the chest are

collected and used as bypass pipes (Figure 4). The interventions of balloon angioplasty followed by stenting or CABG, also injure the artery and vein. They must be treated with dual antiplatelet drugs for one to two years after therapy. Lifestyle change may provide a second life of 10-30 additional life-years.

The blood looks red from many oxygen-carrying red cells (~10 micrometer, diameter), except in leukemia (white blood from many leukocytes). The tiny platelets, (2-3 micrometer in diameter), generated from the fragments of megakaryocyte, without a nucleus, live for 7-8 days in blood (shown by an arrow in Figure 2). The neutrophils swallow the coated bacteria and digests them with lysosomal enzymes and serve as the first line innate immune system. They circulate in blood for only 7-10 hours. The T-lymphocytes trained against foreign antigens, a part of the adaptive immune complex, defend our body against viruses and continuously monitor tumor growth. The B cells in the spleen and lymph nodes, make the specific neutralizing antibody that could kill the virus-infected cells and retain memory of previous infections.

Thrombotic stroke in the cerebral artery and rapid intervention with tPA or thrombectomy

Platelet thrombus forms on the walls of injured carotid artery or after atrial fibrillation or fluttering. Platelet thrombus or embolus blocking the blood flow in the cerebral artery deprive the brain from oxygen iscchemia) and glucose (only nutrient with a reserve of three hours) inducing the Ischemic stroke that kills the regional neurons. About 85% of stroke is thrombotic, which could be lysed by intravenous infusion of a clot-buster enzyme, called tissue plasminogen activator, tPA, cutting the fibrin strands and turning the thrombus into small fragments, called emboli, which are further degraded spontaneously in the patients. Another 15% of bleeding stroke arises from the rupture of cerebral artery under high blood pressure, where tPA is harmful. Only rapid CT-angiography or MRI could differentiate this diagnosis and localize the specific area of the lesion. Thrombectomy with a wire-mesh catheter, can suck out the thrombus and is now more effective for a longer window of 24 hours after stroke. Later CT or MRI scans show the chronological loss of brain from 10 minutes to 6 hours after initiation of stroke and may account for the loss of half of the brain and paralysis.

We and other investigators spent 30 years in developing these tools and technologies using radiolabeled platelets and fibrinogen molecule in large animal models and patients for platelet survival and thrombus imaging studies. These difficult experiments will not be repeated due to many restrictions now. I collected all the relevant data in a book form containing 544 pages by iUniverse so

that they are accessible to young investigators (19).

In this short review, I describe the pictorial views for understanding the mechanism of the complex thromboembolic diseases, their effective interventions, drug regimens and the preventive countermeasures with daily exercise (30 minutes), diets and drugs.

References

1. Figtree GA, Broadfoot K, Casadei B, et al. A call to action for new global approaches to cardiovascular disease drug solutions. Circulation 144: 159-169, 2021.
2. Oh ES, Petronis A. Origins of human disease: the chrono-epigenetic perspective. Nat Rev Genetics. 22: 533-546, August 2021. https://www.cdc.gov/stroke/facts.htmStroke Statistics.
3. Ackerman M, Atkins DL, Triedman JK. Sudden cardiac death in the young. Circulation. 133: 1006–1026, 2016.
4. Grunewald M, Kumar S, Sharife H, et al. Counteracting age-related VEGF signaling insufficiency promotes healthy aging and extends life span. Science 373 (533): 1-9, 2021. eabc8479 (2021).
5. Augustin HG, Kipnis J. Vascular rejuvenation is geroprotective: Vascular endothelial growth factor–A extends life span and health span in mice. Science 373 (6554): 490-491, 2021.
6. Genest J, Libby P. Lipoprotein disorders and cardiovascular diseases. Chapter 48, p 960, Braunwald's Heart Disease, Vol 1, Elsevier Inc., Philadelphia, PA, USA, 2019.
7. Moon JY, Angiolello DJ. Antiplatelet drugs in the management of coronary artery disease. Chapter 56, p1017 in Platelets, Eds. Michelson AD. Academic Press, Cambridge, MA, USA. 4th Edition, 2019.
8. Kolandavelu K, Bhatt DL. Novel antiplatelet therapies. Chapter 55, p1991 in Platelets, Eds. Michelson AD. Academic Press, Cambridge, MA, USA. 4th Edition, 2019.
9. Saver JL. Time is brain. Stroke 37: 263, 2006.
10. Nadal-Ginard B, et al. Myocyte death, and regeneration in cardiac hypertrophy and failure. Cir Res 2003.
11. Dewanjee MK, Tago M, Josa M, Fuster V, Kaye MP. Quantification of platelet retention in aortocoronary femoral vein bypass graft in dogs treated with dipyridamole and aspirin Circulation 69:350-356, 1984.
12. Dewanjee M. Cardiac and vascular imaging with labeled platelets and leukocytes. Sem Nucl Medicine XIV: 154-187, 1984.
13. Steele PM, Chesebro JH, Stanson AW, Holmes DR, Dewanjee MK, Badimon L, Fuster V. Balloon angioplasty. Natural history of the pathophysiological response to injury in a pig model. Circulation Research. 57(1):105-112, 1985.
14. Dietrich WD, Dewanjee S, Prado R, Watson BD, Dewanjee MK. Transient platelet accumulation in the rat brain after common carotid artery thrombosis: An ^{111}In-labeled platelet study. Stroke 24: 1534-1540, 1993.
15. Dewanjee MK. Methods of Assessment of Thrombosis *in vivo*. I n Blood in Contact with Natural and

Artificial Surfaces. pp 541-571, Vol 516. Annals of the New York Academy of Sciences, Dec 28, 1987.

16. Dewanjee MK. Translational research on the cardiovascular and neurovascular thrombo-embolic diseases: Intervention with molecular probes, precision measurements, imaging, tracer developments, drug discovery and improvisation of CV-prostheses. Science and Culture, March-April Issue, a Supplement: S1-S26, 2018.

17. Dewanjee MK. Radioiodination: Theory, Practice and Biomedical Applications. Kluwer Academic Press, Boston, pp 1-621, 1992.

18. On June 5,2019, I made a Grand Rounds Lecture at Lipsett auditorium sharing the podium with another cardiologist at NHLBI, Dr. Manfred Baum: **https://videocast.nih.gov/Summary.asp?file=27593&bhcp=1**

19. Dewanjee MK. Measuring and Imaging Platelet Thrombi and Emboli: Saving Patients from Myocardial Infarct and Stroke with Drugs, Devices and Genetics. iUniverse, Inc., Bloomington, IN, USA. May 17, 2021. Chapter 4. Role of platelets and clotting factors in hemostasis and thrombosis, p79. Chapter 5. Vascular Inflammation. p2; Chapter 6. Labeling human platelets for measuring and imaging platelet thrombus; Chapter 8. Blood biomaterial interactions in multiple device and antiplatelet drugs, p121; Chapter 10. Genetics of coronary artery disease. p229; Chapter 11. Quantitation of platelet thrombi and emboli. p239; Chapter 12. Coronary angioplasty-stenting. p341 and Chapter 15 and Supplement. Vascular Inflammation from Endothelial cell Death, Heart attack, stroke, deep vein thrombosis and micro-clots in COVID-19 infected patients.

মহাদানব

নমিতা কুন্ডু

হে দানব ঝড়,
কোন মায়ের উদরে জন্ম তোমার?
তুমি হওনা বড় ধীরে ধীরে-
জন্মলগ্ন থেকেই তোমার দানব রূপ,
আর জন্মেই শুরু কর তোমার দানবীয় কর্ম কান্ড।
ধ্বংস কর তিল তিল করে গড়ে ওঠা সুন্দর নগরী।
মূহুর্তে শেষ হয়ে যায় কত প্রাণ,
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা কত সংসার।
কে বলবে কেন তোমায় নিঠুর বিধাতা করেন সৃষ্টি?
হয়ত বা কখনো তিনি,
সুন্দর সৃষ্টির চেয়ে ধ্বংসের দিকেই দেন দৃষ্টি।

গোপন কথাটি ...

রঞ্জিত দাসগুপ্ত

ঘটেছিলো ছোট্ট এই ম্যাডিসন শহরেই। বিশ্ববিখ্যাত উইস্কন্সিন ইউনিভার্সিটি যেখানে অবস্থিত। ঘটনার সময় অনেক বছর আগে। কম্পিউটার তখন সবে বাজারে এসেছে কিন্তু ইন্টারনেট আর কথায় কথায় ই-মেইল তখনও চালু হয়নি। এখন যেটাকে বলে ল্যান্ড লাইন সেটাই ছিল যোগাযোগের প্রধান সহায়ক। দেশে ফোন করতে গেলে মিনিটে তিন ডলার খরচা করতে হোতো, সব সময় লাইনও পাওয়া যেতনা। মনে আছে, অল্প কিছু ডলার পকেটে নিয়ে এসে উঠেছিলাম বন্ধুবর অংশুমানের এপার্টমেন্টে। তাই অসুবিধা কিছুই হয়নি। ভাগ্যক্রমে অংশুমান মাস তিনেক আগে কোলকাতা গিয়ে বিয়ে করে এসেছিল। তাই গল্প আর খাওয়া দাওয়া কোনটাই কমতি হচ্ছিলো না। একটা নেমন্তন্নও পাওয়া গিয়েছিলো কিছুদিন পরে এক বৌদির বাড়ীতে। সেখানেই আলাপ আমার মতো আরও পাঁচজন ছেলের সাথে যাদের বিয়ের ফুল তখনো ফোটেনি। নাম – শিশির, সাগর, আবীর, সুকান্ত আর পলাশ। এদের মধ্যে কেউবা ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ ডিগ্রি সম্পন্ন করতে এসেছে, কেউবা জীববিদ্যা বা পদার্থবিদ্যায় ডিগ্রি এবং গবেষণার সুযোগ নিয়ে এসেছে, কেউবা চাকরির সন্ধানে এসেছে। তিনচারজন ইউনিভার্সিটি অধ্যাপকের সাথেও দেখা করার সুযোগ পাওয়া গেল। সকলেই বন্ধুবৎসল ও বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানী বলেই মনে হোল। যত দিন যায় এদের সাথে যোগাযোগ বাড়তেই থাকলো। স্বাভাবিক কারণেই পাঁচজন ব্যাচেলর বন্ধুদের সাথে ক্রমশই দেখা হতে থাকলো এবং জমিয়ে উইকেন্ডএ আড্ডা পরিকল্পনা চলতে থাকলো। শিশিরের একটু পিছনে লাগা স্বভাব ছিল কিন্তু আবীর, সাগর এবং সুকান্ত সবসময় ভারসাম্য বজায় রেখে চলতো। আমি ছিলাম পলাশের ভক্ত এবং ওকে নিয়েই এই গল্প।

পলাশের মত আমুদে এবং বুদ্ধিমান ছেলে সচরাচর চোখে পড়ে না। কথাবার্তায় পারদর্শিতা এবং চেহারায় জৌলুস দুটোই ওর ছিল। ওর কাছে নতুন নতুন জোক শোনবার জন্য আমরা প্রায়ই কাকুতি মিনতি করতাম। এহেন পলাশের একটাই দোষ ছিল যেটা আমার কাছেও দোষ মনে হতো। ওর কাজের প্ল্যান ও কাউকে বলতো না। বিশেষ করে সে কাজটা যদি ওর শুভকাজ বলে মনে হতো। জিজ্ঞেস করলে বলতো – "এটাই আমাদের বাড়ীর নিয়ম, ঠাকুমার কাছে শিখেছি। সবাইকে বললে শুভকাজে বাধা পড়বার সম্ভাবনা"। আরও চাপ দিলে বলতো – "তোরা তোদের কাজ তোদের নিজেদের বুদ্ধি মত করনা গিয়ে। আমারটা তোদেরকে জানাতে হবে কেন?" অকাট্য যুক্তি। কিন্তু তাহলে বন্ধুত্বের অর্থই বা কি হল? সে যাই হোক, এমনি করে তো বছর খানেক হোল। পলাশ জীববিদ্যায় সসম্মানে PhD সম্পন্ন করল। আরও দিন সাতেক আমাদের উইকেন্ডএ আড্ডায় বসবার কথা। যথারীতি গেলামও আমরা চারজনে। কিন্তু পলাশের দেখা নেই। বাড়ীতে ফোন করেও ওকে পাওয়া যাচ্ছেনা। তবে কি গবেষণায় ব্যাস্ত? ফোন করে সেখানেও পাওয়া গেলনা। হতাশ হয়ে যে যার আস্তানায় ফিরে গেলাম। পলাশের কিছু হয়নি। ওর পুরানো গাড়ি নিয়ে কি কোথাও বেরিয়েছে? কোন দুর্ঘটনা হয়নি তো?

আরও দু সপ্তাহ এমনি করে কেটে গেল। দুর্ঘটনার খবর হলে এতদিনে পাওয়া যেত। তাপসদা ও বৌদি আমাদের কাছের লোক। পলাশ ওদেরও প্রিয়। ওদের ধারণা পলাশ দেশে গেছে। ও পাঁচ বছর দেশে যায়নি পড়াশোনার চাপে। খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কাউকে জানায়নি কেন? এর উত্তর অনুমান করতে পারলেও নিশ্চয় করে বলা যাচ্ছে না।

তাপসদার অনুমানই ঠিক। বোঝা গেলো আরও মাস খানেক পরে। পলাশ কোলকাতাতেই গিয়েছিল একটি শুভ কাজ সম্পন্ন করতে যার নাম বিয়ে। ফিরে এসে সবাইকে বলতে আপত্তি ছিল না। বলেওছে। কিন্তু আমরা পাঁচজন তা শুনেও না জানার ভান করে থাকলাম। পলাশের ফোন এলেও উত্তর দেবনা ঠিক করলাম। ও বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখেনি! আমরা কি ওর কাছে আর সকলের থেকে আলাদা নই?

পলাশ অবশ্য জানতো আমাদের ঔৎসুক্য ক্রমে বেড়েই যাবে ওর বিয়ের ঘটনা শুনতে। তাই ও চুপ করেই রইলো। এমনি করে আর কতদিনই বা কাটানো যায়? অবশেষে আমরা নতি স্বীকার করাই ঠিক করলাম। তবে শিশিরের রাগটা যে পড়েনি তা ওর কথায় ভালোমতোই বোঝা গেল। - "আমাদের বলে বিয়ে করতে গেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হতো? আজকালকার দিনে কেউ আবার ঠাকুমার কথা শোনে নাকি? এসব হচ্ছে অহঙ্কার। PhD শেষ করে সেটা আরও বেড়েছে। আমি এর জবাব দেব।"

"তুই আবার কি জবাব দিবি? পলাশ ছাড়া আমাদের আড্ডা তো জমবেই না। তা ছাড়া, ও কাকে বিয়ে করল, সে কেমন এসব জানবার ইচ্ছে হয়না?" – এটা আমার প্রশ্ন। এবারে আবীরের জবাব পাওয়া গেল- "ঠিকই তো, এ সব মান অভিমানের কোন অর্থই হয়না। এই উইকেন্ডেই পলাশের সাথে আপস করা দরকার।" শিশির বলল – "আরে আমি কি এখনই কিছু করছি? সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। আমি যতদূর বুঝি তাতে পলাশের বৌ ওর সাথে আসতে পারেনি। এত তাড়াতাড়ি ভিসা পাবার কথা নয়। কাজেই এখনই প্ল্যান করবার কিছু নেই।" "কি প্ল্যান?" – সুকান্তর জিজ্ঞাসা। "এখনও ঠিক জানিনা। সময় হলে বলব, তাপসদা আর মিতা বৌদিকে ধরতে হবে। ওদেরকে নিশ্চয়ই পলাশ মেয়েটার কথা সবই আস্তে আস্তে বলবে। হয়তো আমাদেরও বলবে। তাহলে তো কথাই নেই।" শিশির যে কি আবোল তাবোল বলছে বোঝা গেল না। আমাদের চারজনের ওই নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই। পলাশের সাথে শনিবার দেখা হবে সেই কথা ভাবতে ভাবতে এপার্টমেন্টে ফিরে এলাম।

শনিবার দুপুরে ক্যাম্পাসে আমরা পাঁচজনে একত্র হলাম। পলাশের ইচ্ছা মতো তাপসদার বাড়ীতেই প্রথমে যাওয়া হল। ওঁরা আমাদের দেখে খুবই খুশী হলেন। আমরা যে আসব, বিশেষ করে পলাশ, তা ওনারা অনুমান করেছিলেন। লাঞ্চ খাবার কিছু ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন।

পলাশ আজ আর কিছুই গোপন করলনা। পলাশের দাদা ওর জন্য তিনটি মেয়েকে দেখবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তার মধ্যে দীপিকাকে দেখেই ওর পছন্দ হয়েছে। দেখতে সুন্দরী না হলেও সাধারণের উর্দ্ধে। ভূগোলে এম এ করেছে। গান একটু আধটু জানে কিন্তু সাধ্য সাধনা করে গাওয়াতে হয়। অপেক্ষাকৃত কোমল স্বভাবের। ভিসার কাজ এখনও শেষ হয়নি তাই দু মাস পরের এয়ারলাইন টিকেট পলাশ করে রেখেছে। তার মধ্যে হয়ে যাবে আশা করা যায়।

দেড় মাস পরে জানা গেল দীপিকার ভিসা হয়ে গেছে – ১৪ই জুন রাত দশটা বেজে পনের মিনিটে প্লেন ল্যান্ড করবে। ওটাই ম্যাডিসন এয়ারপোর্টের শেষ ফ্লাইট। দিনটা এসে গেল। আমরা বেজায় খুশী। তাপসদা ও মিতাবৌদি অভ্যর্থনার জন্য তৈরি হলেন। পলাশ তো রান্নাবান্নার খুব একটা ধার ধারেনা। দীপিকার খাওয়া দাওয়ার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো। সেই সঙ্গে আমাদেরও ওদের বাড়ীতে জমায়েত এর ব্যবস্থা হল। সন্ধ্যে সাতটায় সবাই মিলে হাজির হলাম সেখানে। পলাশকে দেখে মনে হোল বেশ চিন্তিত। কোন দিন তো প্লেনে চড়েনি দীপিকা। যদি ঠিকমতো আসতে না পারে?

ঠিক রাত্রি সাড়ে নটায় পলাশ এয়ারপোর্ট এর দিকে রওনা হল। ও চলে যাবার কিছুক্ষণ পর শিশির আমাদের বলল – "চল আমরাও এয়ারপোর্ট যাই। আমার একটা প্ল্যান আছে। যদি কাজে লাগে।" জিজ্ঞেস করাতে বলল – "কিছু না, দেখি যদি পলাশকে কোন সাহায্য করা যায়। চলনা দেখতে পাবি।" সাতপাঁচ না ভেবে আমরা শিশিরের গাড়ীতে বেরিয়ে গেলাম। অনেকটাই দেরি

হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি এয়ারপোর্টে ঢুকলাম। লাগেজের জায়গায় গিয়ে দেখি একটি মেয়ে এক কোনে দাঁড়িয়ে আছে – সালোয়ার কামিজ পরা, সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শাঁখা। বুঝতে বাকি রইল না ওই দীপিকা। তাহলে পলাশ কোথায়? শিশির যেন এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে এগিয়ে গিয়ে বলল – "আপনি নিশ্চয়ই দীপিকা! আমি শিশির, পলাশের বন্ধু। ওর তো আসবার কথা! যাই হোক, আপনাকে আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবেনা। আমাদের সাথেই চলুন।" দীপিকার যেন ধড়ে প্রাণ এল। বলল – "আপনাদের কথা ওর মুখে অনেক শুনেছি। প্লেনটা দেরি করে এসেছে, তাই হয়তো কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গিয়ে কোথাও আটকা পড়ে গেছে।"

"তা হবে, ওর ল্যাব এও কাজ থাকতে পারে। সে আমরা দেখে নেব। আপনি চলুন তো।"

শিশির, আমরা তিনজন, আর দীপিকা গিয়ে গাড়ীতে উঠলাম, দীপিকার লাগেজ সহ। মিতা বৌদির বাড়ীতে ঢোকা মাত্র বৌদি সরবে এগিয়ে এলেন – "ও মা, কি সুন্দর মেয়ে পছন্দ করেছে আমাদের পলাশ! এসো এসো। আমি তোমার বৌদি। নিশ্চয়ই অনেক ধকল গেছে আসার পথে। কিন্তু পলাশকে তো দেখছিনা।" আমি বললাম – "বৌদি, পলাশকে আমরাও দেখতে পাইনি এয়ারপোর্টে। আমার ধারণা ও এয়ারপোর্ট এই ছিল। প্লেন লেট দেখে উদবিগ্ন হয়ে হয়তো এদিক ওদিক ঘুরছিল বা কফি খেতে ঢুকেছে। ওর যা কফির নেশা! কিন্তু শিশিরটা তো আমাদের খুঁজতেই দিল না। তাড়াতাড়ি করে দীপিকাকে নিয়ে চলে এল। কি যে করে!"

"ও তাই বল, এটা তবে শিশিরেরই প্ল্যান। ওকে তো আমি চিনি। পলাশকে জব্দ করার মতলব" – বৌদির মন্তব্য।

মিনিট কুড়ি পরে পলাশ এসে হাজির। উদ্ভ্রান্তের মত চেহারা। ঢুকেই বলল – "জানিস তো, দীপিকা আসেনি! প্লেন লেট করল। আমি একটু কফি খেতে ঢুকলাম। বেরিয়ে দেখি কেউ নেই, এয়ারপোর্ট ফাঁকা! প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। তাই চলে এলাম। দেখি এয়ারলাইনে ফোন করে।"

দীপিকা তখন অন্য ঘরে তাপসদার সাথে গল্প করছে। মিতা বৌদি আর হাসি চাপতে পারলেননা। বললেন – "পলাশ তুমি হাত মুখ ধুয়ে এসো। দীপিকা ওই ঘরে আছে।"

পলাশের যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। ও দীপিকাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা। কি ভাবে এসেছে জানতেও চাইলনা। হাতজোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল – "তোরা যে আমার কি উপকার করলি! তোরা এয়ারপোর্টএ না গেলে কি যে হতো। তোদের না বলে আমি বিয়ে করতে গিয়েছিলাম, আর কোনদিন এমন হবে না। এবার থেকে সব কথা তোদের বলব, সে শুভই হোক বা অশুভ। বন্ধু বলে কথা। ঠাকুমা যে কেন আমাকে ওসব শিখিয়েছিলেন ..."

শিশির তো এটাই চেয়েছিল। বলল – "মনে থাকবে তো?"

রাত সাড়ে এগারোটা। দীপিকার অপেক্ষায় সবাই ডিনার না খেয়ে বসে ছিলাম। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ

করছে। জমিয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে দাদা বৌদিকে ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা দিলাম। পথে শিশির গান ধরল – "গোপন কথাটি রবেনা গোপনে ..."

আগে কখনো ওকে গাইতে শুনিনি। একেবারে মন্দ নয়। বললাম – "দেখবো তোর বিয়ের সময় কি করিস।"

Gecko Eggs

SARADINDU BANDYOPADHYAY

English Translation by Santanu Dasgupta

On a winter evening, a few of us were discussing politics, although such discussions were against the club rules. If you live in Bihar and want to run a Bengali club, few such rules must be kept written in club register.

The discussion was turning into a war of words between two individual members; rest of us were listening intently.

Prithvi said: "Just donning a Gandhi cap does not a patriot make!"

Chuni, wearing a Gandhi cap: "Can happen. If all 700 million Bengalis wear Gandhi cap then at least 100 million yards of Khaddar (rough cotton textile made with home-made yarn) is sold yielding at least 3 million rupees – money that would fill the bellies of the poor of the nation."

Prithvi: "May be, but wearing a cap, any cap, destroys Bengali character; bare head is the Bengali identity."

Chuni angrily said: "If that is the only character Bengalis have to hold on to for their identity, they should tie a rope around their neck and hang themselves."

Boroda, sitting at a corner table had been looking up at the ceiling, his eyes fixed on the joist beam; suddenly he asked: "Have you seen a gecko smile?"

Suddenness of this unexpected question silenced the two combatants momentarily while rest of us laughed out loud.

After the laughter subsided Boroda said: "This is no joke! I have a reputation of making up stories, but that is infamy spread by slanderers. I can't confirm whether just wearing Gandhi caps would save the nation, but I can provide direct and personal proof that performance of funeral rites at Gaya would release a bonded soul into salvation."

Everyone realized a story was imminent.

Amulya stood up: "Now that Ganja smoke would reign, I'll leave." Amulya turned around at the door, said: "For your own good, you should drive Boroda out of this club or I predict one of these days his Ganja smoke would fill the club and it would fly away like a balloon" and strode away.

Boroda sighed and said: "This happens to all tellers of truth; Jesus too was crucified. Anyway, Rishi give me a cigar."

Rishi said: "No cigar but can get a bidi if you want."

Boroda heaved another sigh and said: "Don't bother, let me look into my pockets…"

Taking a cigar out of his own pocket, he lighted it carefully and began:

The incident was so trivial that I feel a bit embarrassed to talk about it. But as you guys seem determined to hear the story let me get it over with.

See, it is not only humans that become ghosts after death; animals, birds, even insects can become spirits after dying. I found the proof for that once.

This was quite recent – barely two years back. It was holidays, no rush for work. In a carefree mood, I was once again going through Maupassant's stories. Our young writers of today have adopted all his character flaws but not even an iota of his talents: imitation cobras with hood but no venom.

Anyway, one evening I was reading intently at my table, the kerosene lamp was burning bright; suddenly raising my eyes I saw a large gecko had climbed up on to the table and feeding on insects – its audacity astonished me. Geckos, I believe, are the most horrid among all the animals on earth. I can tolerate spiders, cockroaches, caterpillars, turtles, and even toads, but not geckos! Did you know that you can see from ear hole to ear hole clear through a gecko's head? Its tail, severed from the body, jumps around by itself?! At mere sight of a gecko, an unreasonable terror pervades my heart, my stomach feels evacuated, my spine starts to shiver. This may sound funny, but it is not; Duke of Wellington reacted similarly at the sight of a cat. Seeing the gecko move about freely on my table, I jumped off the chair and tried to shoo it away. He turned his head towards me, glowered for some time and then gave a full grin exposing all its teeth.

That is why I asked if you have seen a gecko smile. I have read scientific research papers on dogs' smile, cats' smile, chimps' smiles but I do not remember having heard even such rumors about geckos.

The gecko appeared to have 50000 teeth in his mouth and his grin was totally derisive – it meant "ran away at sight but not ashamed to feign bravery from afar!"

This infuriated me. A lowly gecko, even if six inches long, throwing scorn at me from my own table?! I picked up a heavy dictionary, possibly Webster's, and slammed it at the corner of the table. The gecko moved with lightning speed, turned its head towards me and glared with round eyes, for almost two minutes, and then gave me that 50000-teeth grin again.

My wife was watching this resounding noisy battle from behind curtains in the next room. I looked up at the tinkle of her bangles and saw her shaking with silent laughter. She was well aware of my weakness about geckos. I was inflamed with rage. I still had the dictionary in my hand; now I raised it

with both hands and threw it at the gecko on the table. It was havoc; the lamp turned over, its glass dome crashed onto the floor and the room went dark. Mom rushed out from the kitchen, my younger brother's Hindustani tutor, coaching him in the outer sitting room, kept screaming in Hindi: "Keya hua? Keya hua??" (what happened, what happened). I shouted: "Raghua! Jaldi ektho lonthon le ao!!" (Raghua! Bring a lamp, damn quick). I was fearful standing in the dark lest the gecko came down from the table and climbed up my legs. Raghua came in breathless carrying a lamp; then we saw among the shattered glass pieces the gecko's head sticking out from under the dictionary – rest of his body was crushed to smithereens, but the head was unscathed as if he were peeking at me from under the dictionary sticking its teeth out in a grim demonic grin. It made me tremble from head to foot couple of times; I ordered the loathsome cadaver to be thrown out and went to bed. I did not feel like having dinner.

Several nightmares kept swirling in my sleep during the night; nothing tangible for the consciousness but could not be ignored either as nothing. I woke up with a feeling of restless discomfort. I was glumly sitting in the outer front room drinking my morning tea when suddenly my eyes caught two small eggs lying side by side on the table. They looked like two chalked white koromchas (light pink and white fruits, Bengal currants or Karanda, popular for making chutneys and pickles). I have never seen gecko eggs before but I could swear these were gecko eggs. I made a big fuss interrogating all household servants who was responsible for this, but no one knew anything. I got hold my younger brother Pecho – he broke down to tears under rough questioning but did not admit any wrong-doing. I ordered him to dispose of the eggs as punishment. That this was a mischief designed by someone to scare me became a deep-rooted conviction in my mind. But a little later, I found two small white eggs lying inside my locked cabinet. This gave me pause; who could place eggs there?

In no time the whole household appeared to come under a shower of gecko eggs – they were everywhere. Anywhere you looked or felt, you'd find pairs of gecko eggs. As if the female gecko population of the world were determined to lay their eggs all over in and around our home. This went on for couple of days. We became so confused and apprehensive that we were afraid to touch any surface without looking first lest we touch gecko eggs there.

We could not discuss the problem in any details with outsiders as to them this was not a serious problem of any consequence. You are seeing an infestation of gecko eggs, so what! There was no satisfactory response. I myself tried to explain this rationally but no dice; instead, a feeling that this was not quite normal, not right, kept

passing back and forth in my mind. But common sense refused to accept that all this was the consequence of the accidental violent death of a common gecko. Then what was it? After giving it a lot of thought, I concluded that the murdered gecko's pregnant widow was inconsolable with grief and was avenging his unfair death by going around laying eggs everywhere as a memorial to him. I could not think of anything else.

In this state of stress and disorientation at home, one evening I thought of coming to the club. None of you guys were here during the holidays; the clubhouse was under lock and key. I made the custodian unlock the rooms, light the lamps and I came to sit in this very room. A thin layer of dust had formed on the table. I was going to put the used matchstick in the ash tray after absent-mindedly lighting a cigarette when I saw two gecko eggs lying in ash among the burnt cigarette butts. I left immediately and came back home. My mom took a look at my face and said: "For some days I have been noticing that you are looking pale in the face; aren't you well?" I mumbled something like "Yeah!" and went away to sit alone in the outer room.

No doubt, the situation was getting more incomprehensible. It was impossible to reject it out of hand as the over-fecundity of the Gecko-widow. It was nothing but ghost – the egg-poltergeist! The vengeful gecko has turned into a ghoul and is terrorizing me. In his ghoulish intelligence he has correctly surmised that I am not one to be scared by anything other than gecko eggs. If you guys cannot comprehend why our scriptures urge us to show understanding, kindness and generosity to the lesser lives and why Buddha was ready to sacrifice his own life to save the life of a mere goat, even after seeing my example, then the worst hell is inevitable for you. In reality, I was overwhelmed with repentance and in my remorse kept saying to the spirit of that toothy gecko: "O ghost! O disembodied ethereal spirit! Enough is enough, hold your eggs, please!" But who listens! The same evening, I found two hard boiled gecko eggs under the steaming mound of rice on my dinner plate. Shaking, I got up; mom said: "What is it? Why are you up?" "Not hungry." I said, controlling my shakes with great effort. Lying in bed I overheard my mom scolding my wife: "Foolish girl! Who serves boiled Koromcha with rice? He is sensitive by nature, left without meal just because of the look."

That night I had an unprecedented dream – "unprecedented" because I have never seen anything like it, nor do I wish to see it ever again. I dreamt that no sooner I laid myself on the bed in utter exhaustion than I realized it did not have a cover sheet; instead, it was covered entirely with gecko eggs. Under my body's pressure, the eggs started cracking and hundreds of thousands of black skeletal reptilic baby geckos emerged and started

crawling all over my body. I tried hard to get up and run but you cannot escape in dreams. As I lay groaning, the old large gecko, the one I had killed, clambered over my shoulder to my nose and glared at me. I woke up to the shaking by my wife, sweat streaming down my body and it felt like the baby geckos were still crawling all over me. Brothers! I have had many nightmares and no doubt I'll see many more, but I pray to God that I do not have to see anything like that ever again!

The object of fear that cannot be seen or cannot be neutralized by reason and there is no known way to escape from it – that I believe is the most dangerous in the world. Fear of ghosts falls in that category. As the horror in my heart kept growing, the route for escape from it remained obscure. I could not get any solution as to where to go. Or what to do?

In this state of mind, I got a letter from Subhendu; he wrote from Gaya, the Hindu center for performing funeral rites for departed souls since ancient time. The letter was nothing special: "How are you? I am OK." type. But suddenly I had an epiphany: as if it was not a mere letter but a divine message. I telegrammed Subhendu right away: "Leaving for Gaya today."

Arriving at Gaya, I went to the sacred site and offered "Pinda", the ritual food for departed souls, praying for release of the gecko's tortured spirit. As far as I know, no one has until today offered "pinda" for a gecko. From that moment onwards, there has been no trouble for me. The freed soul is probably on the heavenly walls of Boikuntha (Lord Narayana's abode) and eating insects.